বাঙালি আর
বাংলাদেশির
তফাত করতে হবে
— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

'স্কিল ইণ্ডিয়া'
এক সোনালি
রেখা —পৃঃ ২০

৭০ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ৫ মার্চ ২০১৮।। ২০ ফাল্গুন - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com

সব কা সাথ, সব কা বিকাশ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২০ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৫ মার্চ - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

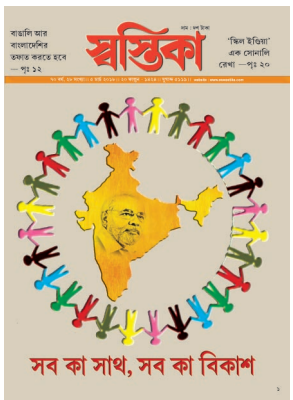

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

পি এন বি প্রতারণাকাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ **১০**

খোলা চিঠি : পঞ্চায়েতে কৃষ্ণই ভরসা তৃণমূলের ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ **১১**

বাঙালি আর বাংলাদেশির তফাত করতে হবে ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ **১২**

সৌদি মহিলাকে পদ্মশ্রী দিয়ে ভারত ইসলামিক বিশ্বের পরিবর্তনকামী মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিল ▯ সাধন কুমার পাল ▯ **১৪**

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির বিরোধিতা করা রাজ্য সরকারের আত্মঘাতী নীতি ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ **১৬**

ভোটার মুসলমান, মানুষ মুসলমান ▯ ১৯

স্কিল ইন্ডিয়া— এক সোনালি রেখা ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ **২০**

কৃষি বাজেটে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সরকারের ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ **২২**

আয়ুষ্মান ভারতে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ হাস্যকর ▯ জয় পণ্ডা ▯ **২৭**

সবার রং মেলানোর উৎসব— দোল ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ **৩১**

মহাভারতের অপ্রধান নারী চরিত্র উত্তরা ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ **৩৩**

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন— এই দুরন্ত চক্রের লেগেছে পাক ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ স্মরণে : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গঠনতন্ত্রের দিকে তাকালে অসংখ্য ডালপালা আর ঘন পাতায় ছাওয়া বটগাছের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সে গাছের ছায়ায় সমকালীন এবং আগামী ভারতবর্ষ সুরক্ষিত। সে গাছ ভারতের পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের আধারস্বরূপ। সেই কারণেই যে মানুষটির মাথায় এই গাছের ভাবনা পল্লবিত হয়েছিল তার কথা জানা আজও প্রাসঙ্গিক। ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। সারা দেশে তিনি শ্রদ্ধেয়, সম্মাননীয় এবং প্রিয় ডাক্তারজী। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা তাঁকে নিয়ে। তাঁর যুগান্তকারী জীবনদর্শন নিয়ে। লিখবেন ড. জিষ্ণু বসু, রন্তিদেব সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সামাজিক বৈষম্য রোধে শিক্ষা সংস্কার

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর স্কুলের ছাত্রদের ব্যাগের বোঝা কমাইতে চাহিয়াছেন। এন সি আর টি-র পাঠক্রম অর্ধেক করিবার কথা বলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই উদ্যোগ শুধু ছাত্রদের নয়, একইসঙ্গে তাহাদের অভিভাবকদেরও আশ্বস্ত করিতেছে। নার্সারি হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দেশব্যাপী একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবা হইতেছে। কেননা পাঠক্রমের এই পার্থক্য সমাজে ভেদভাব সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল বিদ্যালয়ে একই পাঠক্রম প্রচলিত হইবে। কমবেশি পার্থক্য এই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে না। আমাদের দেশে এখনও দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন রহিয়াছে। একটি হইল বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করিয়া বেসরকারি স্কুলে পড়ানো। সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রধানত এইসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। দ্বিতীয়টি হইল, যেসব স্কুলে পড়াশোনার কোনও পরিকাঠামো নাই। বিশেষত গ্রামীণ এলাকায়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই গুণগত পার্থক্যের কারণে শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয় যাহা সামাজিক ভাবে ক্ষতিকারক। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে এই বৈষম্যের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিবর্তন করিতে চাহিতেছে তাহার মূল বিষয়টি হইতেছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একত্রীকরণ। অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাখাতের অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে বরাদ্দ না করিয়া একই বাজেটের আওতায় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত আইনে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা নিঃশুল্ক ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের পরিবর্তিত ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সংস্কারের লক্ষ্য হইল বেসরকারি স্কুলে প্রাথমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিত তৈরি হয়। সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের পাঠক্রমে ফারাক থাকায় তাহা ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীতে বিশাল পার্থক্য গড়িয়া তোলে, যাহা সামাজিক ভাবেও ক্ষতিকারক। শুধু তাহাই নহে, প্রতিযোগিতামূলক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারি স্কুলের ছাত্ররা পিছাইয়া থাকে। ফলে এইসব ছাত্র-ছাত্রী এক ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার হইয়া পড়ে।

অনুমান করা হইতেছে, আগামী এপ্রিল মাসে এই মর্মে একটি বিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পেশ করা হইবে। নূতন শিক্ষা নীতির বিলটি পেশ হইলেই বোঝা যাইবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে সঞ্চালিত করা হইবে এবং শিক্ষা প্রশাসনকেও কীভাবেই বা ঢালিয়া সাজানো হইবে। বস্তুত গত সত্তর বৎসরে শিক্ষা সংস্কারের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলেও ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় নাই। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে, উত্তরপ্রদেশে দশ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নকল করিবার দাবিতে পরীক্ষা বয়কট করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই দাবিতেই স্পষ্ট দেশের কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষার গুণমানের দিকে কোনও নজরই দেওয়া হয় নাই। ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (এন এ এস)-২০১৭-র এক জেলা ভিত্তিক সমীক্ষাতেও শিক্ষাক্ষেত্রের এই দুরবস্থার চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই ছাত্রদের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে। শিক্ষাই সামাজিক ভেদভাব দূর করিতে সমর্থ এবং সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নতিই তাহা সম্ভব করিতে পারে।

সুভাষিতম্

সম্প্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্মসু পরাঙ্মুখঃ।
পীযূষকলসং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি।।

ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও যে সৎকর্ম থেকে দূরে থাকে, সে অমৃতকলস ভেঙে ফেলে বিষভাণ্ডই কামনা করে।

স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন

সন্ত্রাস উপেক্ষা করে আরও প্রসারের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বস্তিকা কার্যালয়ের পাশে হটকেশ্বর ভবনে আয়োজিত হলো পত্রিকাটির দক্ষিণবঙ্গের প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন। হটকেশ্বর ভবনের হলঘরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও শহর থেকে একশো কুড়ি জন বাছাই করা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে সম্পাদক বিজয় আঢ্য স্মরণ করিয়ে দেন স্বস্তিকা হলো সত্তর বছরের একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবার, যা স্বাধীনতার পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশাত্মবোধের প্রচারে ব্যাপৃত রয়েছে। তিনি বলেন, এই পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রচার-প্রতিনিধিরা। শ্রী আঢ্য তাঁর বক্তব্যে দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে বলেন— 'স্বাধীনতার পর সত্তর বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশে পরিণত করার চক্রান্ত হয়েছে। হিন্দু শরণার্থী ও মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের একাসনে বসিয়ে অনুপ্রবেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। স্বস্তিকা না থাকলে বাঙালি তার বৌদ্ধিক শক্তি দিয়ে এই অপচেষ্টা রুখতে পারতো না।' অসমে বাঙালি বিতাড়নের যে জুজু দেখানো হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের চিহ্নিত করতে এরাজ্যেও নাগরিকপঞ্জীর নবীকরণ জরুরি। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণে স্বস্তিকার পরিচালন সমিতির সদস্য তিলকরঞ্জন বেরা স্বস্তিকার সত্তর বছরে সমাজের শ্রদ্ধেয় লেখকদের পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এঁদের বক্তব্যকে জনমানসে বিস্তার করার জন্য প্রচার প্রতিনিধিদের ভূমিকা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, দেশাত্মবোধের জাগরণে স্বস্তিকার ভূমিকায় ভীত রাজ্যের শাসকদলের পরিকল্পিত হামলার শিকার হচ্ছেন প্রচার প্রতিনিধিরা। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র না দমে স্বস্তিকার প্রচার- প্রসারে তাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। সম্মেলনে এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন স্বস্তিকার প্রচার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বস্তিকা পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য জয়ন্ত পাল।

উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ।

চাঁদে ইসরোর ইগলু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইগলুর কথা অনেকেই জানেন। এস্কিমোরা ওল্টানো বাটির মতো দেখতে এক ধরনের ঘর তৈরি করে। বরফ দিয়ে তৈরি এই ঘরের নাম ইগলু। ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো চাঁদে ইগলু তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের নাম লুনার হ্যাবিটাই। বাংলায় চাঁদের বাড়ি। চাঁদের মাটি এবং মৃত্তিকাজাত অন্য কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি হবে ইসরোর ইগলু। দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবে রোবট এবং থ্রিডি প্রিন্টার। প্রাথমিক কাজকর্ম ইতিমধ্যেই শুরু করেছে ইসরো। কেমন হবে চাঁদের বাড়ি, তার ডিজাইন তৈরি করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের প্রধান লক্ষ্য চাঁদে আউটপোস্ট তৈরি করা। ইসরো স্যাটেলাইট সেন্টারের ডিরেক্টর এম আন্নাদুরাই বলেন, 'আন্টার্কটিকার মতো চাঁদেও আমরা আউটপোস্ট করতে চাই। আমেরিকা-সহ বহু দেশ এখন চাঁদে দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরিতে ব্যস্ত। ভারতও এই কর্মকাণ্ডের অংশীদার হতে চায়।' এদিকে চাঁদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। এ ব্যাপারে তাদের ছবি ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে ভারতীয় উপগ্রহ চন্দ্রায়ন-১।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য
৪০০ টাকা।

একাত্তরের যুদ্ধে সেনাকে সাহায্য করেছিল সঙ্ঘ : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বালুরঘাটের মানুষ চুরকা মুর্মুকে চেনেন। ১৯৭১ সালে চুরকা নেহাতই কিশোর। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী ভারতীয় সেনার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের কাছে বারুদভর্তি কার্টন পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানি সেনার গুলিতে মারা যান। চুরকা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চকরাম শাখার মুখ্য শিক্ষক।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের মিরাটে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাষ্ট্রোদয় সমাগম সম্মেলনে চুরকা মুর্মুর কথা উল্লেখ করেছেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে সরসঙ্ঘচালকের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সারাদেশে লোক খেপানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। মোহনজী বলেছিলেন, 'একজন

স্বয়ংসেবকের সৈনিকের শৃঙ্খলা শিখতে ২-৩ দিন সময় লাগে।' কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং মিডিয়ার একাংশ বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, স্বয়ংসেবকের সঙ্গে তুলনা করে মোহনজী সেনাকে অপমান করেছেন। মিরাটের অধিবেশনে চুরকা মুর্মুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি সঙ্ঘ এবং সেনার সম্পর্কের স্বরূপটি স্পষ্ট করলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সাড়ে তিন লক্ষ স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের উপস্থিতিতে মোহন ভাগবত বলেন, 'তখনও বাংলাদেশ তৈরি হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার জন্য পাক সেনার সঙ্গে লড়াই করছে। সেই সময় খবর পাওয়া গেল পাক সেনারা ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ঢুকে পড়েছে। আমাদের স্বয়ংসেবক চুরকা মুর্মু সেই সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকেরা বারুদভর্তি কয়েকটি কার্টন চুরকাকে দিয়ে সেগুলো সীমান্তে পৌঁছে দিতে বলেন। চুরকা বারুদের কার্টন নিয়ে সীমান্তে পৌঁছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে পাক-সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে খানসেনার গুলিতে বীরগতি প্রাপ্ত হন। চকরাম গ্রামে চুরকার স্মৃতিস্তম্ভ এখনও রয়েছে।'

কলকাতায় নাগরিক কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের দাবি

সংবাদদাতা॥ পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় জনবিন্যাসে ভারসাম্য আনতে, মৌলবাদী তথা জেহাদি হিংসা বন্ধ করতে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও প্রত্যার্পণের দাবিতে এবং সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশে পরিণত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনসচেতনতার জন্য গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজ হলে এক প্রবুদ্ধ সভার আয়োজন করে 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য' নামে এক নাগরিক সংগঠন। সভায় বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. মোহিত রায় বিভিন্ন তথ্য সহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক 'বঙ্গদেশে' তৈরি করে তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে উপস্থিত নাগরিকদের আহ্বান জানান, এটি শুধুমাত্র আলোচনাসভা নয়, একটি নতুন আন্দোলন হিসেবে দেখতে হবে। সভায় সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী শুভদীপ রায় এবং গুয়াহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী বিজন মহাজন উভয়েই তাঁদের বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের দাবি তোলার জন্য রাজ্যের মানুষদের কাছে আবেদন জানান। কনভেনশনের আহ্বায়ক প্রখ্যাত সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত জানান, অসম থেকে বাঙালিদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে চিৎকার করছেন তা সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। তিনি বলেন, বাঙালি ও বাংলাদেশির

(বাঁ দিক থেকে) মোহিত রায়, জয়ন্ত রায়, শুভদীপ রায় এবং বিজন মহাজন।

তফাতটি বুঝতে হবে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাঙালি হওয়া যায় না। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে যারা শ্রদ্ধা করেন তাঁরা বাঙালি। অসমে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের চিহ্নিত করা হচ্ছে; হিন্দুদের নয়। সভা থেকে ঘোষণা করা হয় এরপর প্রতিটি জেলায় এই আন্দোলন প্রবুদ্ধ সভার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সচেতনের জন্য 'অসমের মতন পশ্চিবঙ্গে এখনই প্রয়োজন নাগরিকপঞ্জী নবীকরণ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন জাতীয় অধ্যাপক জয়ন্ত রায়।

বাংলাদেশে মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ছে, এই খাতে ব্যয়ও বেড়েছে আওয়ামি লিগ আমলে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন মাদ্রাসা ছাত্র। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে তিন দশমিক সাত শতাংশ, আর মাদ্রাসার তিন দশমিক নয় শতাংশ। বছরে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধির হার তিন শতাংশ। অন্যদিকে মাদ্রাসা বেড়েছে ৪.৬৫ শতাংশ। মাদ্রাসার মধ্যে আলিয়ার চেয়ে কট্টরপন্থী কওমির বৃদ্ধির হার বেশি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত তাঁর 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি' বইতে এসব তথ্য তুলে ধরেছেন। সম্প্রতি বইটির মোড়ক উন্মোচন হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বনাম শিক্ষা বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' শীর্ষক এক আলোচনা সভা। জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ।

অধ্যাপক আবুল বারকাত আলোচনায় বইয়ের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে তিনি বলেন, ২০০৮ সালে দেখা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষায় বছরে ব্যয় আট হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার কোটি টাকায়। ২০০৮ সালে নির্বাচনের পর আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসে, টানা ন'বছর ক্ষমতায় রয়েছে আওয়ামি লিগ। ২০০৮ সালে সারা দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক কোটি। এই এক কোটির মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ ৫২ লক্ষ শিক্ষার্থী কওমি মাদ্রাসার। কওমি মাদ্রাসায় কোনও রকম নিয়মনীতি নেই, সরকারের হস্তক্ষেপও নেই। মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যাও শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অনুপাতের মতোই। বারকাত গবেষণায় মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদে যারা আছেন তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বলেছেন, সরাসরি ধর্মভিত্তিক

আবুল বারকাত

রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামি, ইসলামি শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ও খেলাফত মজলিশ মিলে ৫০ শতাংশ, বিএনপি ২৯ শতাংশ এবং আওয়ামি লিগ ২০ শতাংশ। বাকিদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানা যায়নি। বারকাত তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনা পর্ষদে যারা আছেন তাদের ৯২ শতাংশের ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে না। তারা মাদ্রাসায় পাঠান না নিজের ছেলেমেয়েদের, পাঠান সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা বিদেশে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই মাদ্রাসায় পড়ে। আর মাদ্রাসায় শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৭৫ শতাংশই বেকার।

ড. আবুল বারকাত বলেন, এই বেকারদের হাতে যদি কোনও কিছু তুলে দিয়ে বলা হয়, ইসলামি রাজত্ব কায়েম করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে, তাহলে এই কাজে তাদের নামানো সহজ হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা পশ্চাৎপদ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা বিনির্মাণে মাদ্রাসা শিক্ষা বাধা তৈরি করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও জঙ্গি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করছে। বারকাত বলেছেন, এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০৫০ সাল নাগাদ কী অবস্থা সৃষ্টি হবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আলোচকরা বলেছেন, গবেষণায় কিছু বিপজ্জনক তথ্য উঠে এসেছে। কওমি মাদ্রাসার হার যেভাবে বাড়ছে, এটা দেশের জন্যে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ধর্মবাজার সম্প্রসারণে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন, অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, মওলানা আবুল আলা মওদুদী জামায়াতে ইসলামির মতো ধর্মান্ধ দল গড়েন পাকিস্তানে, যার শাখা রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতে। মওদুদী কিন্তু তার সন্তানদের কাউকেই মাদ্রাসায় পড়াননি। জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গেও তাদের সম্পৃক্ত করেননি। আধুনিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করেছেন। এটা এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। এদিকে যেদিন অধ্যাপক বারকাতের গবেষণা প্রকাশ করা হয়, সেদিনই সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেসিন আয়োজিত বিরাট সমাবেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকার ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী, এককালের জাঁদরেল বাম নেতা নূরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই সমাবেশে। সমাবেশ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ইসলামি শিক্ষার সর্বোচ্চ উন্নয়ন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে অধিদপ্তর তৈরি করা হয়েছে। ৩০ একর জমির ওপর ৪১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেন।

নতুন শিক্ষানীতিতে মেয়েদের শিক্ষায় জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে মেয়েদের শিক্ষা এবং নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরম্পরাগত শিক্ষা, ভাষা, খেলাধুলো এবং গণিতচর্চার মতো বিষয়ে। সূত্রের খবর, খেলাধুলোকে স্কুলপর্যায়ের সিলেবাসে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র। এযাবৎ খেলাধুলোকে 'অতিরিক্ত বিশেষ শিক্ষা'র তালিকায় রাখা হতো। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভাবনায় রয়েছে খরচ কমানোর বিষয়টি। মেয়াদ (মে, ২০১৯) শেষ হবার আগে কেন্দ্রীয় সরকার একটি আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চাইছে। তার জন্য ইসরোর প্রাক্তন প্রধান কে. কস্তুরীরঞ্জনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি-সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী নতুন শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করার কাজ প্রায় শেষ। জমা দেওয়ার কথা মার্চে। কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষানীতিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির রমরমা কমানোর কথা ভাবা হবে। সরকার শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যের বিরোধী। সেই কারণে প্রাইভেট কোচিংয়ে রাশ টানতে চাইছে সরকার। যে সব জায়গায় উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই, মেটানো হবে সেই অভাবও।

উবাচ

"একটি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ৪৮ বছর দেশ শাসন করেছে। অন্যদিকে আগামী মে মাসে এন ডি এ সরকার ৪৮ মাস পূর্ণ করবে। বুদ্ধিজীবীরা কংগ্রেস এবং এনডিএ সরকারের আমলে প্রাপ্তি নিয়ে বিতর্ক করুন।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

পুদুচেরীতে এক জনসভায় ভাষণে

"আমি তো আশ্চর্য হচ্ছি তাঁর মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি এঁদোপুকুরে ভেসেছিলেন কী করে!"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি

বাইচুং ভুটিয়ার তৃণমূল দল থেকে ইস্তফা প্রসঙ্গে

"যারা 'ভারতমাতা কী জয়' ও 'বন্দে মাতরম্' বলতে ঘৃণাবোধ করে তারা পাকিস্তানি।"

সুরেন্দ্র সিংহ
বিধায়ক, উত্তরপ্রদেশ

বালিয়ায় এক জনসভায় ভাষণে

"জালিয়াতির খবর সামনে আসার পরে এত দ্রুত ব্যবস্থা আগের কোনো সরকার নেয়নি।"

অমিত শাহ্
বিজেপির জাতীয় অধ্যক্ষ

পিএনবি-র দুর্নীতি প্রসঙ্গে

"প্রথাগত পড়াশুনায় ভালোভাবে পাশ করাকেই ভারতে সাফল্য ধরা হয়। পাশ করো, ভালো চাকরি পাও আর দারুণ জীবন কাটাও। এর মধ্যে সৃজনশীলতা কোথায়!"

স্টিভ ওজনিয়াক
কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ

ভারতে সাফল্যের মানদণ্ড প্রসঙ্গে

পি এন বি প্রতারণাকাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক

দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। তখন কোনও কারণে দিনের বেলায় কোনও রাস্তায় আলো জ্বলতে দেখা গেলে লোকের মুখে শুনতাম, 'সরকারকা মাল দরিয়া মে ডাল।' অর্থাৎ, সরকারের সম্পত্তি যথেচ্ছ অপব্যবহার করো। তখন কথাটার অর্থ ততটা বুঝিনি। আজ তেমন দুর্নীতি কথাটার অর্থ পাঁচ বছরের শিশুও গড়গড় করে বলে দেবে। আমাদের শৈশবে আমরা তেমনটা জানতাম না। দুর্নীতি বলতে আমরা ঘুষ নেওয়াকে বুঝতাম। কলকাতা কর্পোরেশনকে লোকে বলতো চোরপোরেশন। যেখানে ঘুষ না দিলে কোনও কাজ পাওয়া যায় না। সমস্ত সরকারি অফিসে অসংখ্য ঘুষুড়ে বাবুরা বসে থাকতেন বকরূপী ধর্মরাজ হয়ে শিকারের আশায়। কিন্তু এখন জামানা পাল্টেছে। এখন আর পাঁচশো, হাজার টাকা কেউ ঘুষ নেয় না। মান সম্মান থাকে না। পাঁচশো হাজার কোটি টাকা প্রত্যারণা করলে সমাজে বুক ফুলিয়ে চলা যায়। সম্প্রতি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে দুই হীরক ব্যবসায়ী নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসি যুক্তভাবে সাড়ে এগারো হাজার কোটি সরিয়েছে। সুদে আসলে ব্যাঙ্কের ক্ষতি কমপক্ষে ২২ হাজার কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই দুই প্রতারককে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তারা নিরাপদে বিদেশে পালাবার পরেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সক্রিয় হয়েছে।

এসব তথ্য এখন সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সকলের জানা। ব্যাঙ্ক প্রতারণা নুতন কোনও ঘটনা নয়। পরাধীন ভারতে ব্যাঙ্ক ফেল করিয়ে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত অর্থ ব্যাঙ্ক মালিকরা আত্মসাৎ করে পালাতো। স্বাধীন ভারতে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ভুয়া সংস্থা খুলে ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে। ভারতের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক শুধু এই কারণে আজ বিপুল লোকসানে চলছে। তবু কেন্দ্রীয় বিত্ত মন্ত্রক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নজরদারি নেই। তারা দুর্নীতি বা প্রতারণার দায় চাপিয়েছে পি এন বি কর্তৃপক্ষের উপর। স্বীকার করছি, নজরদারির দায় দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে পি এন পি-র। তবে যৌথভাবে দেশের সমস্ত সরকারি-বেসরকারি ব্যাঙ্কের লেনদেনের উপর নজরদারির দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিত্ত মন্ত্রকেরও থাকে। সেই দায়িত্ব এখন তারা স্বীকার করছে না। দেশের সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উপর যতটা বেশি ততটা বেসরকারি ব্যাঙ্কের উপর নয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বেসরকারি ব্যাঙ্কের মালিক ব্যাঙ্ক ব্যবসা

গূঢ়পুরুষের কলম

গুটিয়ে পালালে বিশেষ কিছু করার থাকে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কোনও ব্যক্তি বা পরিবারের নিয়ন্ত্রিত সংস্থা নয়। তাছাড়া 'রাষ্ট্রায়ত্ত' কথাটার মধ্যেই মালিকানা যে রাষ্ট্রের কথাটা বোঝানো হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষ একে সরকারি ব্যাঙ্ক বলেই মনে করেন। আস্থা রাখেন যে, তাঁদের আমানত সুরক্ষিত থাকবে। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিত্ত মন্ত্রকের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে। পি এন বি প্রতারণা কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে আইন তৈরি করতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাঙ্ককে জেনে নিতে হবে যে, গ্রহিতা ঋণের বিপুল টাকা কেন নিচ্ছে এবং খরচ করবে কিসে। যেভাবে নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসিকে সাড়ে এগারো হাজার কোটি টাকা মুম্বইয়ের পি এন বি-র একটি শাখা ব্যাঙ্কঋণ দিয়েছে সেভাবে জেহাদি সংগঠনও দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে বিপুল ঋণ নিতে পারতো। তখন তার দায় নিত কে? সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ঋণ খেলাপির তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বর্তমান আইনের ফাঁকফোকর নিশ্চয় আছে। তা বন্ধ করার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বিত্ত মন্ত্রককে নিতে হবে। না নিলে প্রতারকচক্র ভবিষ্যতে বহু ব্যাঙ্ককে পথে বসাবে।

স্বাধীন ভারতে প্রথম বড়সড় আর্থিক প্রতারণা ঘটেছিল পঞ্চাশের দশকে। কলকাতার ব্যবসায়ী হরিদাস মুন্দ্রা জীবন বিমা কর্পোরেশনের কাছে ভুয়া শেয়ার বিক্রি করে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। সম্ভবত হরিদাস মুন্দ্রা একমাত্র ব্যবসায়ী যিনি আদালতে দোষী প্রমাণিত হয়ে পুরো সময় জেল খাটেন। তারপর হর্ষদ মেহতার শেয়ার কেলেঙ্কারি এবং আবদুল তেলগির স্ট্যাম্প দুর্নীতিতে সরকারি কোষাগার থেকে লুঠ হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া আছে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বোফর্স কামান কেনার কাটমানির দুর্নীতি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতারণায় জড়িত ছিলেন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসি মন্ত্রীরা। হরিদাস মুন্দ্রা মামলায় তদন্ত করতেই রাজি ছিলেন না তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কারণ, মুন্দ্রার জালিয়াতিতে যুক্ত ছিলেন নেহরুর আস্থাভাজন একজন প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি মন্ত্রী। কিন্তু নেহরুর জামাই, ইন্দিরার স্বামী ফিরোজ গান্ধী নেহরুকে বাধ্য করেছিলেন এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করতে। পরিণামে মুন্দ্রাকে জেলে যেতে হয়। পি এন বি কাণ্ডে প্রায় দুই ডজন অফিসার এবং কেরানি ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করতে কড়া দাওয়াই চাই। তাই সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজকে মাথায় রেখে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক। কমিশন ব্যাঙ্ক জালিয়াতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বর্তমান আইনের সংশোধনের সুপারিশ করুক। কয়েকজন অসাধু কর্মচারী ও অফিসারের সাহায্য নিয়ে এতবড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিলে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। পি এন বি-র মুম্বই শাখায় এই জালিয়াতি চলেছিল টানা সাত বছর। কেউ বাধা দেয়নি। কেউ প্রশ্ন তোলেনি কেন কোনও সম্পত্তি বন্ধক না রেখে নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসিদের বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ দিচ্ছে ব্যাঙ্ক।

এই বেনিয়মটা দেখার কথা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের। তাঁকে স্বপদে রেখে নিরপেক্ষ তদন্তটা হবে কীভাবে? ■

পঞ্চায়েতে কৃষ্ণই ভরসা তৃণমূলের

মাননীয় অনুব্রত মণ্ডল
সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস
বীরভূম

কেষ্টদা, আপনিই ভরসা। কৃষ্ণ নামেই কাটুক ভোটের দিনগুলি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা তখনও সেভাবে বাজেনি। আপনি অবশ্য তখন থেকেই নিজস্ব মেজাজে ছিলেন। অতীতে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দেওয়া আটকাতে বোমা-গুলি মারার নিদান দিয়েছিলেন। আপনি বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি, কিন্তু গোটা রাজ্যের মডেল। দলের মহিলা ব্রিগেডকে অস্ত্র করেই পরিকল্পনা সফল করতে চান মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় কেষ্ট, আমার কেষ্টদা।

সিউড়িতে বীরভূমের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত একটি সমাবেশে গিয়ে আপনি বলেন, আগামী পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ে সামনের সারিতে মহিলাদের রাখা হবে। আড়াই থেকে তিনি হাজার মহিলা প্রতিটি মিছিলের সামনে থাকবেন। তাঁদের পিছনে থাকবেন পুরুষরা।

দলের মহিলা কর্মীদের চাঙ্গা করতে আপনি যা বলেছেন, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল কিছু বললে তার মধ্যে অনেক অন্তর্নিহিত মানে তো খুঁজতেই হয়। এক্ষেত্রেও মহিলাদের সামনে রেখেই পঞ্চায়েত নির্বাচন করার কথা বলে আপনি যে মনোনয়ন পর্ব থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে চাইছেন, সেটা আমি বুঝে গেছি। আসলে আপনাকে আমি খুব ভাল চিনি। শ্রদ্ধাও করি। আপনার মাথায় অক্সিজেন কম গেলেও বুদ্ধি যথেষ্ট। দিদি মানে মমতা দিদিও সব জানেন। তবুও কিছুদিন আগেই বীরভূমে গিয়ে ভাষায় সংযত হতে বলে আপনাকে সতর্ক করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সতর্কতাকে তোয়াক্কা না করেই বিরোধীদের গুড়-বাতাসা হুমকি দিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়ে বের হলেই গুড়-বাতাসা। দিদি সব শুনেও কিন্তু কিছুই শোনেননি। আসলে দিদি জানেন এটাই তো হবে মডেল।

পঞ্চায়েতে গুড়-বাতাসা, পুরসভায় চড়াম চড়াম ঢাক বাজানো, এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থীরা যদি বাড়াবাড়ি করে তাঁদের মুণ্ডরের সাইজ দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জয়ঢাক বাজানোর নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন আপনি। আমি কিন্তু কোনও অপরাধ দেখি না। আরে বাবা দলের শক্তি বাড়াতে হবে। আরও শক্তি চাই। আর এই যুদ্ধে আবার নীতিটিতি মানতে গেলে হয় নাকি!

এবার তো আপনি যা বলেছেন, তাতে মনোনয়নের দিন থেকেই গুড়-বাতাসা শুরু হবে। আপনি সাদা ভাষায় বলেছেন, মনোনয়নের দিনগুলিতে ব্লক অফিসের সামনে তিন হাজার মহিলা দাঁড়িয়ে থাকবেন। তাঁদের মাথায় থাকবে ঝুড়ি। ঝুড়ির মধ্যে থাকবে বাতাসা। কাঁখে কলসি। সেখানে জল থাকবে। যাঁরা মনোনয়ন জমা দিয়ে আসবেন তাঁদের গুড়-বাতাসা আর জল দিয়ে আপ্যায়ন করবেন দলের মহিলা সমর্থকেরা।

বীরভূমে পরের পর নির্বাচনে আপনি নিজের স্টাইলে নির্বাচন করান। যা শুরু হয়েছিল পাঁচ বছর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে। সেবারও গুড়-বাতাসায় নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার জেরে সিউড়ি ২, ইলামবাজার, বোলপুর, লাভপুর ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থীরা। জেলা পরিষদের ৪২টি আসনের মধ্যে ১৪টি-তে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় এসেছিল তৃণমূল প্রার্থীদের।

আমি জানি, আপাতনিরীহ এই গুড়-বাতাসা বলতে পার্টিকর্মীরা যা বোঝেন সেটাই বলতে চেয়েছেন আপনি। মনোনয়ন কেন্দ্রের ধারেপাশে মহিলাদের এত জমায়েত কেন সে প্রসঙ্গে কেউ কোনও প্রশ্ন করলে উত্তরই দেবেন না। ঝুড়ির ভিতর বাতাসার নামে অন্য কিছু থাকবে কিনা সেটা অবশ্য আপনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, যেখানে যেমন পরিস্থিতি তেমনই হবে। সাত দিন ধরে গরমের সময় মনোনয়ন জমা হবে। কারও কারও মাথা গরম হয়ে যেতে পারে।

আচ্ছা বীরভূমের কেষ্টদা, আপনাকে কি সবাই ওয়াকওভার দিতে পারে না! একটা অসুস্থ মানুষের কথা ভেবে কেউ কি একটু জল-বাতাসা দিতে পারে না!

—সুন্দর মৌলিক

বাঙালি আর বাংলাদেশির তফাত করতে হবে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

অসম সরকার নাগরিক পঞ্জীকরণের কাজ শুরু করতেই, দেশের ভিতর একটা মহল হই হই রব ফেলে দিয়েছে। এই মহলে রয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা। নাগরিক পঞ্জীকরণের বিষয়টিতেই এদের ঘোর আপত্তি। অথচ এই নাগরিক পঞ্জীকরণ কিন্তু সময়ের দাবি। বিগত বছরগুলিতে অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে অসমের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছিল। শুধু তাই নয়, অসম তথা সমগ্র দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে বসেছিল। পূর্বতন কংগ্রেস সরকার শুধুমাত্র সংখ্যালঘু মুসলমান ভোটের খাতিরে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল এবং পরোক্ষে অবাধ অনুপ্রবেশে মদত দিয়েছিল। অসমে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে, অসমে সামাজিক - অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই নাগরিক পঞ্জীকরণের কাজ শুরু করেছে। এই কাজটিই কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থীদের না-পছন্দ্। অসম সরকারের নাগরিক পঞ্জীকরণের বিরোধিতা করতে গিয়ে এরা সুকৌশলে অসমিয়া-বাঙালি বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। এরা বলছে, অসম সরকারের এই নাগরিক পঞ্জীকরণের ফলে অসমে বসবাসকারী বাঙালিরা বিপন্ন হয়ে পড়বে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে এটি একটি চক্রান্ত বলে চালানোরও চেষ্টা করছে এরা। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন, অসম থেকে যাঁরা চলে আসবেন, তাঁদের তিনি পশ্চিমবাংলাতে স্থান দেবেন। এছাড়া আরও একটি অভিযোগও এই বিরোধীরা তুলেছে। তারা বলছে, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উদ্দেশ্য নিয়েই এই নাগরিক পঞ্জীকরণের কাজ শুরু করেছে অসম সরকার।

নাগরিক পঞ্জীকরণের যারা বিরোধিতা করছে তাদের অভিযোগগুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য ? বাঙালি বলতে এরা কাদেরই বা বোঝাতে চাইছে? এদের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে— যারা বাংলায় কথা বলছে তাদের সকলকেই এরা বাঙালি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করছে। কিন্তু সে কি সম্ভব? বাঙালি জাতিসত্তা কীভাবে নির্ণয় হবে? মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র ইংরেজিতে কথা বললেই কেউ ব্রিটিশ হয়ে যায় না। সারা বিশ্বে সাদা চামড়ার বহু মানুষ আছেন, যাঁরা ইংরেজিতে কথা বলেন। যেমন, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, কানাডিয়ান প্রমুখ। কিন্তু তাঁরা কেউই ব্রিটিশ নন। তেমনই, ফরাসি ভাষায় কথা বললেই কেউ ফরাসি হয়ে যান না। লাটিন আমেরিকায় বেশ কিছু পূর্বতন ফরাসি অধ্যুষিত দেশ রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা ফরাসি ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ই ফরাসি নন। আসলে, কে কোন জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণয় হয় অন্যভাবে। একজন ব্রিটিশ বা একজন ফরাসি জাতিসত্তায় প্রকৃত ব্রিটিশ কিংবা ফরাসি কি না নির্ণয় হবে তখনই, যখন তিনি চিরাচরিত ব্রিটিশ এবং ফরাসি সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত হবেন, সেই সংস্কৃতির অনুসারী হবে তার সমাজজীবন। শুধুমাত্র কোন ভাষায় কথা বলছেন— তা দিয়ে তার প্রকৃত জাতিসত্তা নির্ণীত হবে না। ভাষা তার জাতিসত্তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটিমাত্র মাপকাঠি হতে পারে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি নয়। তেমনি এই পশ্চিমবাংলা এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষরা বাংলায় কথা বলে। কিন্তু বাংলায় কথা বলি বলেই আমরা সবাই জাতিসত্তায় বাঙালি হয়ে গেলাম— বিষয়টি কিন্তু তা নয়। এই বাংলাভাষীদের মধ্যে জাতিসত্তায় বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে তাদেরই যারা চিরাচরিত বাঙালি সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত এবং যাদের সমাজজীবন সেই বাঙালি সংস্কৃতির অনুসারী। এখন প্রশ্ন— এই চিরাচরিত বাঙালি সংস্কৃতি বলতে আমরা কোন সংস্কৃতিকে বুঝব?

চিরাচরিত বাঙালি সংস্কৃতি বলতে আমরা কাকে বুঝব? চিরাচরিত এই বাঙালি সংস্কৃতি আসলে আটহাজার বছরেরও পুরনো সনাতন সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মুসলমান বা খ্রিস্টান আগ্রাসনেরও অনেক আগে সনাতন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভাগীরথীর দুই তীরে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল— সেই সমাজজীবন যে সংস্কৃতির অনুসারী ছিল সেটিই প্রকৃত বাঙালি সংস্কৃতি। অনেক ঐতিহাসিক ইসলাম এবং খ্রিস্টান সংস্কৃতিকেও বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে চালাতে চান বটে— তবে তা অপচেষ্টা মাত্র। বাঙালি সংস্কৃতি দোল-দুর্গোৎসবের সংস্কৃতি, কীর্তন চর্যাপদের সংস্কৃতি, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সংস্কৃতি, চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ সেনের সংস্কৃতি। আরব অথবা ইউরোপিয় সামাজিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতি নয়, যাদের সমাজজীবন আরব অথবা ইউরোপিয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তারা জাতিসত্তায় বাঙালি নন। কাজেই যাঁরা পিতাকে বাবা, মাতাকে মা সম্বোধন করেন, আকাশকে আকাশ বলেন, শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রণাম করেন— তাঁরা জাতিসত্তায় প্রকৃতই বাঙালি— সে তিনি কলকাতায় থাকুন অথবা ঢাকায়। কিন্তু যাঁরা বাবাকে আব্বা, মা-কে আম্মা, আকাশকে আসমান, প্রণামের বদলে সালামওয়া-

লেকুম বলেন— পশ্চিমবঙ্গে বাস করে বাংলায় কথা বললেও জাতিসত্তায় বাঙালি নন। যিনি বাংলার দেবমন্দিরকে কলুষিত করলেন, যিনি বোরখা আর তিন তালাক প্রথায় আবদ্ধ থাকার সামাজিক রীতিকে গ্রহণ করলেন--- তিনি বাংলায় কথা বললেও জাতিসত্তায় বাঙালি নন।

যারা নাগরিক পঞ্জীকরণের বিরোধিতা করছে— তারা বাঙালি এবং বাংলাদেশিদের এই পার্থক্যটিই করছে না। অথচ সামাজিক-রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে কে বাঙালি আর কে-ই বা বাংলাদেশি, এটি নির্ণয় করা সবিশেষ জরুরি। অসম সরকার নাগরিক পঞ্জীকরণের মাধ্যমে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করেছে। বিরোধীদের প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে— জাতিসত্তায় প্রকৃত বাঙালি যারা, তাদের শঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছে না অসম সরকার। নাগরিক পঞ্জীকরণের সম্পূর্ণ তালিকাটি এখনও প্রকাশ পায়নি। আরও একটি তালিকা প্রকাশিত হবে। যদি তাতেও নাম না থাকে, তাহলে তথ্য প্রমাণসহ আবেদন করারও সুযোগ থাকছে। কাজেই, প্রকৃতই যিনি বাঙালি কেন তিনি শঙ্কিত হবেন? আর বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীরা? নাগরিক পঞ্জীকরণের বিরোধীরা তাদেরও বিভ্রান্ত করার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আগেই ঘোষণা করেছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যে হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে চলে এসেছে, সরকার তাদের শরণার্থীর মর্যাদা দেবে এবং এই দেশে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ স্বীকৃতিও দেবে। অর্থাৎ কোনও দিক দিয়েই বাঙালি জাতিসত্তার মানুষদের বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই। তাহলে বাঙালি বিপন্ন— এই আওয়াজ তোলা হচ্ছে কেন? তোলা হচ্ছে অবৈধভাবে এদেশে আসা বাংলাদেশিদের আড়াল করতে এবং আশ্রয় দিতে। বাঙালি বিপন্ন আওয়াজ তুললেও, প্রকৃত বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে যে এই বিরোধীরা আদৌ ভাবিত নয়, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আচরণে। নাগরিক পঞ্জীকরণের কাজ শুরু করার পূর্বেই অসম সরকার এই রাজ্য থেকে অসমে গিয়ে বসবাসকারী বাঙালিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু তা জানায়নি। কেন জানায়নি? এটা কি নিছকই গাফিলতি, নাকি তথ্য গোপনের প্রয়াস?

নাগরিকপঞ্জীর বিরোধীরা বলছে, অসম সরকার নাগরিক পঞ্জীকরণের ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করছে। কিন্তু নাগরিক পঞ্জীকরণের উদ্দেশ্যটি যদি সুচিন্তিতভাবে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এই ছাঁকনিতে অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে যাবে। যে মুসলমান সাত অথবা চৌদ্দ পুরুষের ভারতীয়— তার তো এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তাকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে কেউ চিহ্নিতও করছে না। কিন্তু কোনও মুসলমান যদি বেআইনিভাবে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে এসে এদেশে গেঁড়ে বসেন, জেহাদি এবং মৌলবাদী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আতঙ্কিত হবেন। কারণ, এই ছাঁকনিতে তিনি অবশ্যই ধরা পড়বেন এবং পত্রপাঠ তাকে বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তানে ফেরত যেতে হবে।

অসম যেভবে নাগরিক পঞ্জীকরণের কাজ করছে, অনুরূপভাবে সেই একই কাজ পশ্চিমবঙ্গেও করতে হবে। অসমের মতো একই সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গও দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত। মালদা,মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দুই চব্বিশ পরগনা, কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে গত চার দশক ধরে অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। সীমান্তবর্তী এই সব অঞ্চলে চোরাচালান, গোরুপাচার, নারীপাচার এবং জঙ্গি জেহাদি কাজকর্মও বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ যে একটি প্রধান সমস্যা তা সবকটি রাজনৈতিক দলই এর আগে স্বীকার করেছে। সিপিআই নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময়ই স্বীকার করেছিলেন— বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থাকার সময়ও একই কথা বলেছিলেন। রাজ্যের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও স্বীকার করেছিলেন, এই রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংসদ সদস্য থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে অভিযোগ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড করিয়ে দিচ্ছে সিপিএম। কিন্তু আজ যখন অসম সরকার এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়ন করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পদক্ষেপ করছে— তখন তারই বিরোধিতায় নেমে পড়েছে এরা। আসলে সত্যটা অনুধাবন করলেও, ভোটের স্বার্থে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আড়াল করতে নাগরিক পঞ্জীকরণের বিরোধিতা করছে এরা।

অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গেও অবিলম্বে নাগরিক পঞ্জীকরণের দাবিতে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সব রকম প্রশাসনিক বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করেই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে রাজ্য সরকরের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে নাগরিক পঞ্জীকরণের পথে সরকার পা বাড়াতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বার্থে, সর্বোপরি সমগ্র দেশের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ■

সৌদি মহিলাকে পদ্মশ্রী দিয়ে ভারত ইসলামিক বিশ্বে পরিবর্তনকামী মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিল

সাধন কুমার পাল

ইরানি মহিলারা হিজাব খুলে আগুনে পুড়িয়ে সেই সমস্ত ছবি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে দিচ্ছে। ভাইরাল হয়ে যাওয়া এই ধরনের ছবি ও ভিডিও এখন মানুষের হাতের কাছে। সৌদি আরব-সহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলমান দেশ থেকে তো অনেকদিন ধরেই কট্টরপন্থার বাঁধ ভাঙার খবর আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বজুড়ে যে ১৯২টি দেশ যোগদিবস পালন করছে তাতে ৪৭টি মুসলমান দেশ আছে এই সংবাদ এখন পুরানো হলেও প্রাসঙ্গিক। ইসলামিক বিশ্বের এই পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ভারতের উপর দিয়েও। ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আইন পাশ করে তিন তালাক নামক মধ্যযুগীয় কুপ্রথা তুলে দিয়ে মুসলমান মহিলাদের মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। পুরুষ অভিভাবক বা 'মেহরাম' ছাড়া মুসলমান মহিলাদের হজে যাওয়ার অধিকার দিয়ে সরকার ইতিমধ্যেই মোল্লাতন্ত্রের উপর বড় আঘাত হেনেছে।

রাজ্যসভায় তিন তালাক বিল আটকে দিয়ে এই আঘাতের পাল্টা প্রত্যাঘাত হেনে মোল্লাতন্ত্র, কট্টরপন্থার অঘোষিত রক্ষাকর্তা ভারতের তথাকথিত স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীলরা বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের পুরানো ধ্যান ধারণা আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। শুধুমাত্র তিন তালাক বিল আটকে দেওয়াই নয়, এই ধ্যান ধারণার জেরে তারা ভারতে সেই সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চান যার জেরে কেউ হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করে হিন্দুত্বের পথে চলতে চাইলে তাকে মানবতা মানবাধিকারের মতো মানব সমাজের অমূল্য সম্পদের উপর থেকে অধিকার হারাতে হবে। সে জন্যই উত্তর প্রদেশের দাদরির আখলাকের মৃত্যুর প্রতিবাদে মানবাধিকারের স্বঘোষিত ঠিকাদাররা কবিতা লেখেন, পুরস্কার ত্যাগ করেন, প্রতিবাদের ঝড় তোলেন আবার কাশগঞ্জে বন্দে মাতরম্ বলার দায়ে চন্দন গুপ্ত নামে হিন্দু যুবকের মৃত্যু হলে তাঁরা মৌন থাকেন। হিন্দু মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসাতে গিয়ে মুসলমান যুবক রিজিয়ানুর রহমানের মৃত্যু হলে ওঁরা রাস্তায় নামেন, মোমবাতি মিছিল করেন কিন্তু মুসলমান মেয়েকে প্রেম নিবেদন করার অপরাধে অঙ্কিত সাক্সেনার মতো হিন্দু যুবককে জবাই করে হত্যা করলে ওরা মৌনব্রত অবলম্বন করেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের উপর পাথরবৃষ্টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও পাথর নিক্ষেপকারীদের, সন্ত্রাসবাদীদের মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেন।

ইসলামিক রক্ষণশীল কট্টরপন্থী ও তাদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীলতার মুখোশধারী প্রতিনিধিদের আপত্তি উপেক্ষা করে ভারত যে বিশ্বজুড়ে পরিবর্তনের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে বদ্ধপরিকর তার প্রমাণ পাওয়া গেল ২০১৮ সালের পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপকদের নাম নির্বাচনে। সৌদি নাগরিক নউফ মারওয়াইকে পদ্মশ্রী সম্মান দিয়েছে ভারত সরকার। সৌদি আরবে যোগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন ৩৭ বছর বয়সী মারওয়াই। সৌদিতে যোগ প্রসারে অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। 'ইসলামে যোগ নিষিদ্ধ' বলে ভারতেও জারি হয়েছিল ফতোয়া। সৌদি আরবের মতো ইসলামের অনুশাসন মানা দেশে যোগ স্বীকৃতি পেয়েছে। ফেসবুকে মারওয়া লিখেছিলেন, 'শরীরের সঙ্গে মন, আবেগ ও আত্মার মেলবন্ধন ঘটায় যোগ। ভেঙে দেয় চরমপন্থার বেড়া।' নউফয়ের আরও দাবি, 'ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে আমাকে সাহায্য করেছে যোগ। আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ, তিনি আমায় যোগের রাস্তায় এনেছেন।' সৌদি আরবে যোগের পথিকৃৎকে ইতিমধ্যেই সম্মানিত করেছে সে দেশের ভারতীয় দূতাবাস। আর এবার (২০১৮) তাঁকে ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী সম্মান দিয়েছে সরকার।

৬ ডিসেম্বর ২০১৭। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে অনুষ্ঠিত হলো লেবাননি গায়িকা হিবা তওয়াজী ও পশ্চিমি পপ সিঙ্গার সেলিন ডিয়োনের রুদ্ধশ্বাস সঙ্গীতানুষ্ঠান। সৌদি আরবের ইতিহাসে প্রথমবার প্রকাশ্য মঞ্চে মহিলা শিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই কনসার্টকে ঘিরে সৌদি মহিলাদের আবেগ উচ্ছ্বাস ছিল অকল্পনীয়। রিয়াধের কাফে থেকে নৃত্য সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে, বাইরে রঙবেরঙের পোশাকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে যুবতীরা, অপেক্ষা তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য। সৌদি আরবের রাজধানী শহরে এরকম অবিশ্বাস্য দৃশ্য এখন স্বাভাবিক ব্যাপার।

সৌদি আরব সরকার দেশের সিনেমা হলগুলি আবার খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ঘোষণা অনুসারে ২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই ওই দেশের সিনেমা হল গুলিতে সিনেমা প্রদর্শনও শুরু হতে চলেছে। জানা গেছে এই উদ্দেশ্যে প্রায় ৩৫ বছর আগে ইসলামিক কট্টরপন্থীদের চাপে বন্ধ হয়ে যাওয়া মোট ৩০০টি সিনেমা কমপ্লেক্স খুলে দেওয়া হবে যাতে সৌদি আরবের মানুষ আবার নিজের দেশেই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার সুযোগ পায়। সৌদি সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এখন থেকে মহিলারা স্টেডিয়ামে গিয়ে ফুটবল খেলা উপভোগ করতে পারবে। আগামী জুন মাস থেকে সৌদি মহিলারা একা গাড়িও চালাতে পারবেন। সৌদি আরবে সিনেমা- সঙ্গীত, মহিলাদের স্টেডিয়ামে গিয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখা, একা গাড়ি চালানোর অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি বড় সিদ্ধান্ত। সৌদিতে শুরু হওয়া এই পরিবর্তন স্থায়ী হবে কিনা তা এখনই বলা না গেলেও এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে ওই দেশের নতুন শাসক ৩২ বছরের যুবক প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমানের নেতৃত্বে ধর্মীয় ও আর্থিক সংস্কারের এক উল্লেখযোগ্য কাজ শুরু হয়েছে। সৌদি আরবের ৬৫ শতাংশ মানুষের গড় বয়স ৩০ বছরের নীচে। সৌদি যুবক মানেই জেহাদি— বিশ্বজুড়ে এই ছবি মুছে ফেলে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চায় এই যুব সমাজ। ফলে প্রিন্স সলমানের এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় সৌদি আরবের যুবসমাজ-সহ রাজ পরিবারের

অধিকাংশ মানুষের এতটাই সমর্থন রয়েছে যে, কট্টরপন্থীরাও অনিচ্ছা থাকলেও সমর্থন না দিয়ে পারছেন না। এই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পুলিশদের ক্ষমতা অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে। এই ধর্মীয় পুলিশদের এতটাই ক্ষমতা ছিল যে, ধর্মীয় ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলে চরম শাস্তির মুখে পড়তে হতো সৌদি নাগরিকদের। শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনার প্রয়াস চলছে। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বস্তরীয় প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিবছর ১৭০০ সৌদি শিক্ষককে ফিনল্যান্ড পাঠানোর পরিকল্পনা হয়েছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি তাদের অনুসারে বিজ্ঞান ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে প্রোজেক্ট বানানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ইসলামকে জানা— এই ভাবনাটি এখন লঘু করে দেওয়া হচ্ছে।

১৯৭৯ সালের আগে সৌদি আরবে ইসলামি কট্টরপন্থীদের আতঙ্ক সৃষ্টিকারী দাপাদাপি ছিল না। সামাজিক রীতিনীতি ছিল আর পাঁচটা পশ্চিমি দেশের মতোই খোলামেলা। প্রিন্স সলমান সৌদি আরবকে ১৯৭৯ সালের আগের খোলামেলা সমাজ উপহার দিতে চান। সৌদির সংস্কারপন্থী এই নেতার কথায় ইসলামে উদারীকরণ নয়, ইসলামকে তিনি যুগোপযোগী করে তুলতে চান। তিনি ওই দেশের কট্টর পন্থী ভাবধারাকে খোলা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নয়, ইসলামে উগ্রপন্থী ভাবধারায় ইতি টানার কথা সরাসরি বলছেন। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। 'সমাজে খোলা মেলা ব্যবহার চালু হওয়া উচিত, সঙ্গীত-কলা চর্চার মুক্ত পরিবেশ, ভিন্ন মতের মানুষের প্রতি সম্মানের পরিবেশ তৈরি হওয়া উচিত'। উদাহরণ হিসেবে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন পয়গম্বর মহম্মদের সময় মদিনাতে মহিলাদের ব্যবসায়ী এমনকী বিচারক হিসেবেও কাজ করতে দেখা গেছে।

এ বিষয়ে বোধহয় কোনও সন্দেহ নেই যে অনুকূল পরিস্থিতি না পেলে রক্ষণশীলতা ভেঙে খোলামেলা সমাজ তৈরির প্রয়াস তো দূরের কথা সৌদি আরবে প্রিন্স সলমানের মতো একজন সংস্কারপন্থী নেতার আবির্ভাবই সম্ভব হতো না। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলমান দেশের লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাও এই ধরনের সংস্কারের পক্ষে মুখ খুলছেন। জর্ডন, টিউনিশিয়া এমনকী সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে বেশ কিছু খোলামেলা সংস্কার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

এমনটা মনে হতে পারে কী এমন ঘটনা ঘটলো যা থেকে মুসলমান বিশ্ব আজ খোলামেলা সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করছে? একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিশ্বে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ছোবলে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার ৯৫ শতাংশই মুসলমান সমাজের। এ জন্যই বোধহয় খোদ সৌদি আরবের বুকে দাঁড়িয়ে ২০১৭ সালের মে মাসে পঞ্চাশটির বেশি মুসলমান দেশের সম্মেলনে সেই সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে ডোনাল্ড ট্র্যাম্প কোনও রাখঢাক না করেই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার খোলা আহ্বান জানানোর

পর এর প্রতিবাদে মুসলমান বিশ্বের কোনও জায়গা থেকে একটি শব্দও শোনা যায়নি। বিগত চার দশকে আর কোনো পশ্চিমি রাষ্ট্র প্রধানকে প্রশংসা সূচক বাক্য উচ্চারণ না করে সন্ত্রাসবাদকে সরাসরি ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করে কথা বলতে শোনা যায়নি। এক সময় সৌদি আরব ও ইরান ইসলামি মতবাদের দুটি প্রধান ধারা বিশ্বজুড়ে কট্টর ইসলামি মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। চার দশক পর সেই প্রতিযোগিতামূলক হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও উন্মাদনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। সৌদি আরবের মতো ইরানেও ধর্মীয় সংস্কার প্রক্রিয়ার শুরু হবে এমন আশা অনেকেই করছেন।

প্রিন্স সলমানের আর্থিক সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান সর্বাত্মক সমর্থন পেলেও দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নির্মূলে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি না নিয়ে সরকারি অর্থে মিউজিক কনসার্ট আয়োজনের মতো পদক্ষেপ নিয়ে প্রবল অসন্তোষও তৈরি হচ্ছে। আর্থিক ভাবে সবল সমাজের যে অংশ শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য পশ্চিমি দেশগুলিতে যাতায়াত করছে তাদের পূর্ণ সমর্থন থাকলেও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজের রক্ষণশীল অংশ এই সংস্কার প্রক্রিয়া ভালোভাবে নিচ্ছে না। ফলে সৌদি যুবকদের একাংশের মধ্যে এই সমস্ত সংস্কারপন্থী মুসলমান শাসকদের নির্মূল করার জন্য জেহাদে যোগ দিতে ইরান আফগানিস্তান, সিরিয়ায় যাওয়ার প্রবণতাও রয়েই গেছে।

সৌদি আরব পৃথিবী ব্যাপী সমস্ত মুসলমানের আদর্শ ভূমি। সেখানে যদি সত্যিই খোলামেলা সমাজ ব্যবস্থা, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হয় তা হলে ইন্টারনেট সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সমস্ত মুসলমান বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না। ইসলামের ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও অন্য ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিজ নিজ রুচি, ভাবনা অনুসারে খাওয়া-পরা-চলা-বলা শুরু হয় তাহলে বিশ্বের রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের কাছেও এই ধরনের সংস্কার ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবে ভারতেও মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল অংশের মধ্যে সৌদির এই পরিবর্তনের সদর্থক প্রভাব পড়বে। তবে তিন তালাক নিয়ে আইন পাশে যারা বাধা দিচ্ছেন সেই ব্রেকিং ইন্ডিয়া ব্রিগেড সহজে লড়াইয়ের ময়দান ছাড়বে বলে মনে হয় না, কারণ ধর্মান্ধতা ও রক্ষণশীলতাই তাদের শক্তির মূল আধার। ■

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির বিরোধিতা করা রাজ্যসরকারের আত্মঘাতী নীতি

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, It is distance that breeds enmity। কথাটা মিথ্যে নয়। প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে যে অঞ্চল যত দূরে থাকে তারা ততটাই ক্ষমতার সুখ থেকে এবং উন্নয়ন থেকেও বঞ্চিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সত্যটি প্রণিধানযোগ্য। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিই যোগাযোগের প্রশ্নে দিল্লি থেকে অনেক দূরে এবং রাজনীতিতে রাজ্যস্তরেও একই কথা খাটে। আলিপুরদুয়ারকে কেবল নতুন জেলার মর্যাদা দিলেই এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ঘোচে না। কলকাতা থেকে আঠেরো ঘণ্টার দূরত্বও ঘোচাতে হবে। এই দূরত্ব থেকেই আসে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিরোধিতা।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানচন্দ্র অধ্যায়ের পর বিশেষ করে বামপন্থী শাসনের শুরু থেকেই কেন্দ্র বিরোধিতার শুরু। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন ক্ষমতা থেকে চলে যান তিনি রাজ্যের কোষাগারে কয়েকশো কোটি টাকা রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেববাবু ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা দেনা রেখে যান যা ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। এটা কে না জানে তাঁর অক্ষমতাই সাফল্যের প্রতি বিরক্তির কারণ। বর্তমানে সর্বভারতীয় বিকাশ মানচিত্রে পেছিয়ে পড়া এই রাজ্যের কেন্দ্র বিরোধিতারও অন্যতম কারণ নিজের অক্ষমতা।

বাংলার কেন্দ্রবিরোধী অবস্থান কোনও নতুন ঘটনা নয়। মহাভারতের যুদ্ধে শক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কৃষ্ণ-বিরোধী কৌরবপক্ষকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমর্থন করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, দুর্যোধন পত্নী ছিলেন কলিঙ্গের কন্যা।

সেই ধারা দীর্ঘকাল বহন করে চলেছিল এই বঙ্গে বামেরা। কাজী নজরুলের সেই অনবদ্য ছত্রটি মনে পড়ে : 'যুগে যুগে মরে বাঁচে পুনঃপাপ দুর্মতি কুরুসেনা/দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা।' বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও একই পথের পথিক। চল্লিশ শতাংশ সংখ্যালঘু ও এক বিরাট সংখ্যক 'Selfstyled Secular' হিন্দু বাঙালি বামপন্থীর রাজ্যে অন্ধ কেন্দ্রবিরোধী অবস্থান বজায় না রাখলে ক্ষমতায় থাকা কঠিন, এই সত্যটাই বর্তমান রাজ্য সরকারের চালিকা শক্তি। তাই অতীতেও অশোক মিত্রমশাই বলছেন একই কথা। অবশ্য অমিতবাবুকে মনমোহন সিংহের মতো, 'উত্তরে থাকো মৌন' পথ অবলম্বন করতেই বেশি দেখা যায়।

> বাংলার বিশ্ববঙ্গ লোগোয় সরকারি মান্যতা এক ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বহন করছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া একমাত্র জম্মু-কাশ্মীরই পদ্মফুল, জলাশয়, তরবারি, ধানের শীষ-সহ স্বতন্ত্র সরকারি লোগো ব্যবহার করে। সে রাজ্যের লেটার হেডে অশোক স্তম্ভ নেই।

এটাতো ঘটনা আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রশ্নে শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্বের প্রভাব বা দাপট অনেকখানি। বিধানচন্দ্রের সময়কালে তা বাংলার মানুষ দেখেছে। পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা কখনোই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধকে আত্মস্থ করতে পারেনি। গোপালন তো প্রকাশেই ঘোষণা করেছিলেন তাদের লোকসভায় ঢোকার উদ্দেশ্যই হলো To wreck the system from within. পরবর্তীকালে ডাঙ্গের (যিনি নিজেকে বৈদান্তিক মার্কসিস্ট বলতেন) জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাকে 'জাতীয়' শব্দটি জ্যোতিবাবুদের মধ্যে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এক সুচতুর ছলনার সাহায্য নিয়ে ভিটে হারানো হিন্দু বাঙালিদের জন্য কুমিরের কান্নায় ভাসিয়ে দেয় রাজ্যকে। সেই সঙ্গে জ্ঞানপাপী পূর্ববঙ্গাগত 'শিক্ষিত' বাঙালি হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের নিরাপদ গ্যালারিতে এসে নাস্তিক প্রগতিশীলতার মধ্যে অক্ষয় প্রসাদ লাভ করে। প্রগতি গণ-আন্দোলনের তুফানে নবান্ন, কোমলগান্ধারের মাধ্যমে দেশভাগের দেশি কারিগরদের আড়ালে রেখে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রেণী শত্রু হিসেবে বেছে নেয়। একাত্তরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও মরিচঝাঁপির ঘটনার পরেও বাঙালি চিনলো

না কমিউনিস্ট নামধারী এই ট্রয়ের ঘোড়াদের।

এদের এই কেন্দ্রবিরোধী অবস্থান বর্তমান রাজ্য সরকারের মধ্যেও একই মাত্রায় বর্তমান। বামফ্রন্ট আমলে পরিকল্পনা কমিশনের আধিকারিকদের চিঠি পেয়ে অন্য রাজ্য সরকার অফিসার বা মন্ত্রী পাঠিয়ে যখন যোজনার কর্মসূচি রূপায়িত করত, পশ্চিমবঙ্গ চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিত না। বছরের পর বছর গণতন্ত্র দিবসে অংশ না নিয়ে রাজ্যকে জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার যখন যে কর্মসূচি গ্রহণ করছে আমাদের রাজ্য সরকারকে তার বিরুদ্ধে পথে নামতে দেখা যাচ্ছে। ঘৃণার তীব্রতা এতটাই বেশি যে অশোকস্তম্ভ চিহ্নর পাশাপাশি বিশ্ববঙ্গ লোগো এনে বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গকে প্রাসঙ্গিক করার অসাধ্য সাধন করতে চাইছেন। দেশের বাইরে গেলেই দেখা যায় ইউরোপ আমেরিকার গড় মানুষজন জানেই না বাংলাদেশের মানচিত্রের বাইরে বাঙালি আছে। এই বাংলার বিশ্ববঙ্গ লোগোয় সরকারি মান্যতা এক ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বহন করছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া একমাত্র জম্মু-কাশ্মীরই পদ্মফুল, জলাশয়, তরবারি, ধানের শীষ-সহ স্বতন্ত্র সরকারি লোগো ব্যবহার করে। সে রাজ্যের লেটার হেডে অশোক স্তম্ভ নেই। বর্তমান রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কোন কোন কর্মসূচির বিরোধী অবস্থান নিয়েছে তা দেখা যেতে পারে।

গত ২০১৫-র জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন কর্মসূচি ঘোষিত হয়। দেশের একশোটি শহরকে আধুনিক ও উন্নত করার লক্ষ্যে এ এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চারটি শহরকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এগুলি হলো কলকাতা, বিধান নগর, নিউটাউন ও হলদিয়া। এমনিতেই এ রাজ্যের শরীর

জ্যোতি বসু

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মমতা ব্যানার্জী

বলতে কিছুই নেই। সবটাই কলকাতা। সেখানে দূরবর্তী কোনও কোনও শহরকে অন্তর্ভুক্তির দাবি রাজ্যসরকার জানাতেই পারতো। তা না করে দশটি গ্রিন সিটির দাবিতে অনড় থেকে উন্নয়নের শরিক হতে পারলো না।

মে ২০১৬-র রিয়েল এস্টেট রেগুলেশন অথরিটি অ্যাক্ট এমনই আর একটি কর্মসূচি যেখানে রাজ্যসরকার শামিল হতে চায়নি। এছাড়া অভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়টিরও ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের ঘোরতর বিরোধী অবস্থান নেওয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। সর্বত্র সর্বনাশা ভাষা নীতির ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এ রাজ্যের ছাত্র- ছাত্রীরা পিছিয়ে পড়েছে।

নদী সংযোগের প্রশ্নে মানস, তিস্তা, গঙ্গাকে ঘিরে রাজ্যের তরফে ও স্বার্থে সরকারের বক্তব্য থাকতেই পারে। কাবেরী জল বণ্টন নিয়ে যদি আলোচনা চলতে পারে এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল।

সর্বোপরি স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' বিষয় দুটিকে ঘিরে রাজ্য সরকারের আত্মঘাতী নীতি অক্ষমের মিথ্যা আস্ফালনের সমগোত্রীয়। কেবল পাইকারি হারে সবুজ সাথীর সাইকেল শহরের মধ্য ও উচ্চবিত্তদের বিতরণ করে সরকারের মধ্যরাতের তেল খরচ বেড়েছে। তেমনই মুর্শিদাবাদ, মালদহের মতো জেলাগুলোতে সংখ্যালঘু স্কুল ছাত্রীদের বিবাহ চল্লিশ শতাংশ থেকে নামানো যায়নি। সরকারি পরিসংখ্যান একথা বলছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচির বিরোধিতা করাই যেন এ রাজ্যের দস্তুর। অতীতে এই পথে হেঁটে বামেরা উন্নয়নের দৌড়ে কানাগলিতে নিয়ে গিয়েছে এ রাজ্যকে, বর্তমান সরকারও সে পথেই চলেছে।

(লেখক হেরিটেজ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

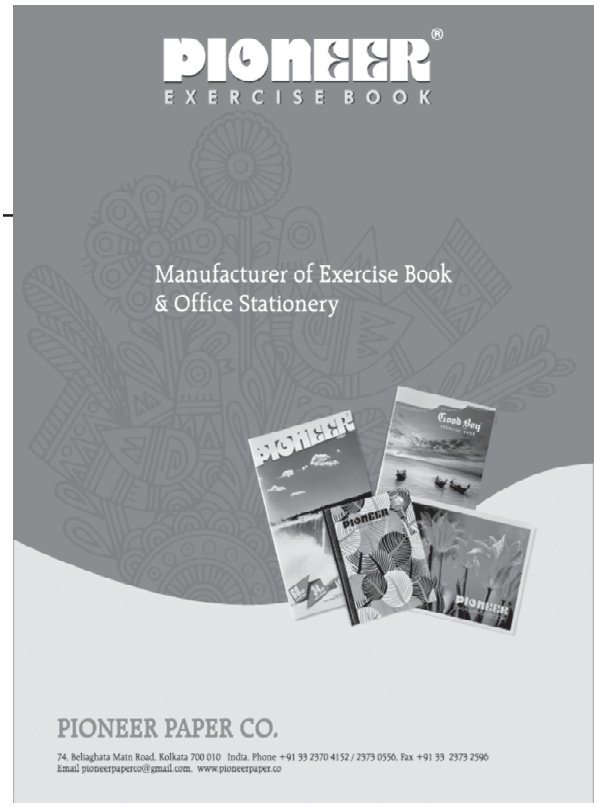

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

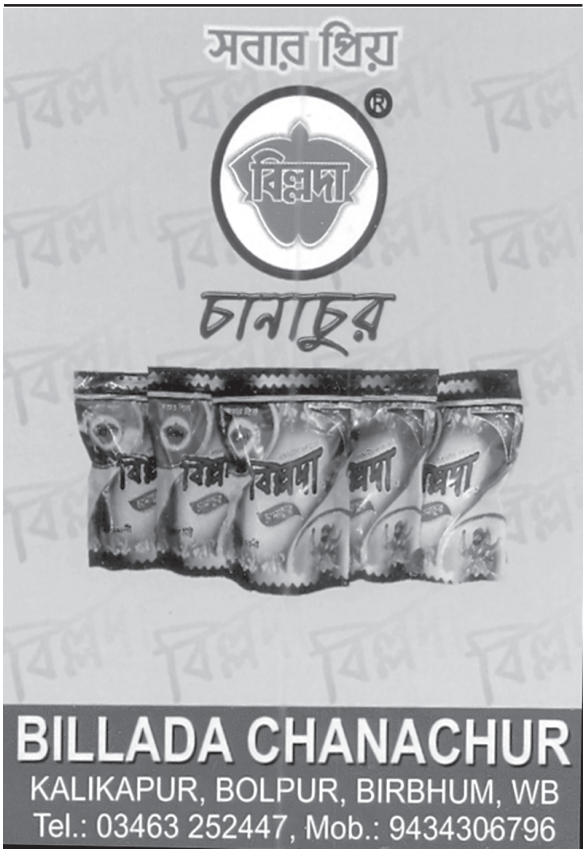

ভোটার মুসলমান, মানুষ মুসলমান

দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' নীতির সফল রূপায়ণ সম্ভব নয়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার সেটা বিলক্ষণ জানে। সেই কারণে মোদী সরকার প্রথম থেকেই সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সংবেদনশীল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় তিন তালাক বিলের কথা। এযাবৎ কোনও সরকারই কয়েকশো বছর ধরে চলে আসা মুসলমান মহিলাদের প্রতি এই অবিচারের কথা ভাবেনি। মুসলমানরা তাদের কাছে শুধুই ভোটার, বড়জোর হিন্দুদের চাপে রাখার মেশিনারি, মানুষ মোটেই নয়। কিন্তু মোদী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। সেই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পাওয়া যায় হজযাত্রীদের কোটা বাড়ানোর সিদ্ধান্তেও। ইউপিএ আমলে গঠিত সাচার কমিটি জানিয়েছিল, মুসলমানদের উন্নতির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ জরুরি। সেই রিপোর্টের ব্যাখ্যা এবং সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিতাভ কুণ্ডুর নেতৃত্বাধীন কমিটিকে। কুণ্ডুকমিটির ৭৬টি সুপারিশের ৭৪টি গ্রহণ করেছে মোদী সরকার। ক্ষমতায় এসেই মোদী সরকার সংখ্যালঘু উন্নয়নে ৩,১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। যার মধ্যে ওই অর্থবর্ষে খরচ হয়েছিল ২,৯০০ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, জনবিকাশ কার্যক্রম, নয়ি রোশনি, নয়ি মঞ্জিল ইত্যাদি। গত চার বছরে ৫২,৪০০ জন মুসলমান যুবক-যুবতী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে চাকরি

পেয়েছেন। সম্প্রতি সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ৪০,২১০ জন 'শিখো আউর কামাও' প্রকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের আর একটি প্রকল্প নয়ি মঞ্জিল। প্রশিক্ষণ মূলত হস্তশিল্প তৈরিতে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পেও অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। নয়ি রোশনি মুসলমান মেয়েদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার প্রকল্প। এছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকদের একটা বড় অংশ পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর বন্ধ হয়েছে পাথর ছোঁড়া।

গুরুত্বপূর্ণ সাগরমালা প্রকল্প

মোদী সরকারের সাগরমালা প্রকল্প একই সঙ্গে সামরিক এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। খরচ ধরা হয়েছে আশি লক্ষ কোটি টাকা। উদ্দেশ্য, ৬টি অত্যাধুনিক বৃহৎ সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং ১৮৯টি পুরনো বন্দরের সংস্কার করা। এছাড়া গড়ে তোলা হবে ১৪টি উপকূলবর্তী ইকোনমিক জোন, কমপক্ষে ২৯টি ইকোনমিক ইউনিট। এইসব বন্দরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আধুনিক করে তোলা হবে খনি, রেলপথ এবং বিমানবন্দর। তৈরি হবে নতুন সড়ক। এর ফলে রপ্তানি রাজস্বের পরিমাণ ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাড়বে বলে সরকারের অনুমান। উল্লেখ্য, সাগরমালা প্রকল্প প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন প্রথম এনডিএ সরকারের উদ্ভাবনা। এটি ছিল স্বর্ণ চতুর্ভুজ প্রকল্পের অনুসারী প্রকল্প। ক্ষমতায় এসে বর্তমান সরকার প্রকল্পটি অনুমোদন করে। সেই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ১২টি বন্দর এবং ১২০৮টি দ্বীপ সংস্কার করা হবে। ভারতের ১৪,৫০০ কিলোমিটার পরিবহণযোগ্য জলপথ রয়েছে এই প্রকল্পে। সামরিক দিক থেকে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটি এক নজরে এই রকম :

যেসব বন্দর গড়ে তোলা হবে :

সাগরদ্বীপ—পশ্চিমবঙ্গ।
পারাদ্বীপ—ওড়িশা। (আউটার হারবার)
শিরখাজি—তামিলনাড়ু।
এনায়াম—তামিলনাড়ু।
বেলিকেরি—কর্ণাটক।
বাদাবন—মহারাষ্ট্র।

দক্ষতা উন্নয়নের এই কর্মসূচি মানবসম্পদের যথাযথ এবং প্রকৃত ব্যবহারের পথটি দেশের সামনে খুলে দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকেও উজ্জ্বল করেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষেও এক সোনালি রেখা হয়ে উপস্থিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর 'স্কিল ইন্ডিয়া'র স্বপ্ন।

স্কিল ইন্ডিয়া—এক সোনালি রেখা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

একটি দেশের সার্বিক উন্নতি অনেকটাই নির্ভর করে, সেই দেশের মানব সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহারের উপর। মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রয়োগ— একটি দেশের উন্নতির পক্ষে কতখানি সহায়ক হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জাপান এবং জার্মানির মতো দেশগুলি। ভারতে এই মানব সম্পদের কোনও ঘাটতি নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে, স্বাধীনতার পর থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত এই বিপুল মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের দিকে পূর্বতন কোনও সরকারই নজর দেয়নি। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মানবসম্পদের যথাযথ প্রয়াগের উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপও নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ অদূর ভবিষ্যতেই দেশে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা যেমন বাড়াবে, তেমনই দেশের উন্নয়নের পক্ষে অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই উপলব্ধি করেছিল, মানব সম্পদকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে দেশের যুবকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির দিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ক্ষমতায় আসার পরই মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দক্ষতা উন্নয়ন (স্কিল ডেভেলপমেন্ট) ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক গঠন করে। এই মন্ত্রক গঠনের পর যুবকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবধরনের উদ্যোগকে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক (এন এস কিউ এফ)-এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২.৫ কোটি যুবক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এর ভিতর আবার ১ কোটিরও বেশি প্রশিক্ষণ নিয়েছে ২০১৭ সালে।

শিল্পের উপযুক্ত দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের জন্য ২০১৭ সালেই প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র নাম দিয়ে কাজ শুরু করা হয়। বিভিন্ন জেলায় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২৭টি রাজ্যের ৪৮৪টি জেলা এবং ৪০৬টি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ৫২৭টি কৌশল কেন্দ্র বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩২৮টি কেন্দ্র কাজ শুরু করেছে। ১৫০টি কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। গত বছরই হায়দরাবাদে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে সারা দেশে এরকম ১৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। দেশের ৫টি অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়নের উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব স্কিল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ইন্সটিটিউট টাটা গোষ্ঠীর সহায়তায় মুম্বইয়ে গড়ে তোলা হবে।

এ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় তপশিলি জাতি-উপজাতি-সহ সমস্ত শ্রেণীর যুবক-যুবতীদের জন্য স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ৩৫টি ক্ষেত্রে ২৫২ ধরনের কাজের জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৭-র ডিসেম্বর পর্যন্ত আনুমানিক

৪০ লক্ষ যুবক-যুবতী এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং আরও ৫ লক্ষেরও বেশি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। নির্দিষ্ট ফিজ-এর বিনিময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। নির্মাণ, বিপণন, রেফ্রিজারেশন মেকানিক, ওয়াশিং মেশিন মেকানিক, বিমা সংক্রান্ত কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৭৫ লক্ষ যুবক এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্তদের জন্য বিশেষ ধরনের কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মিজোরামের ব্রু, মহারাষ্ট্রের কাটকারি এবং ওড়িশার ৬২টি আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য এই প্রকল্পগুলি কাজ শুরু করেছে। এদের কর্মসংস্থানেরও সহায়তা করা হচ্ছে।

সমগ্র দেশেই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা আই টি আই-গুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য সারা দেশে ১৩,৯১২টি আই টি আই স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে গত বছর ৫৫৭টি আই টি আই গড়ে তোলা হয়েছে। এইসব আই টি আই-গুলিতে গত এক বছরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭, ০৪০টি থেকে ২.৮২ লক্ষে পৌঁছেছে।

২০১৭-র অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা দক্ষতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান ভিত্তিক সচেতনতার মাধ্যমে জীবন-জীবিকাকে উৎসাহ দিতে 'সংকল্প' এবং শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দক্ষতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'স্ট্রাইভ' নামে দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। সংকল্প-এর জন্য ৪৪৫৫ কোটি টাকা এবং 'স্ট্রাইভ'-এর জন্য ২২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দুটি প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে।

গঙ্গানদী পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী এবং অসম রাইফেলসের সঙ্গেও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই দুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একইরকম ভাবে উর্জ গঙ্গা গ্যাস পাইপ লাইন প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত দক্ষ কর্মী বাহিনীর ব্যবস্থা করতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম, গেইল, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (ভুবনেশ্বর) এবং লেবার নেট-এর মধ্যে একটি চতুষ্পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

যুবকদের শিল্পোদ্যোগে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে শিল্পোদ্যোগ পুরস্কার ২০১৭ প্রদান করা হয়েছে। গত নভেম্বর মাসে দিল্লিতে ১০ জন যুব উদ্যোগপতিকে ৫ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। দুটি সংস্থার জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে এবং মেন্টরদের জন্য তিনটি পাঁচ লক্ষ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

গত বছর অক্টোবরে প্রযুক্তিগত শিক্ষানবিশি বিষয়ে জাপান সরকারের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি ভারত ও জাপানের ভিতর সহায়তাকে আরও প্রসারিত করবে। গত বছর অক্টোবরের ১৪-১৯ আবুধাবিতে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের ১৩০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিনিধিরা একটি রৌপ্য, একটি ব্রোঞ্জ এবং ৯টি বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

সব মিলিয়ে দক্ষতা উন্নয়নের এই কর্মসূচি মানবসম্পদের যথাযথ এবং প্রকৃত ব্যবহারের পথটি দেশের সামনে খুলে দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকেও উজ্জ্বল করেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষেও এক সোনালি রেখা হয়ে উপস্থিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর 'স্কিল ইন্ডিয়া'র স্বপ্ন। ■

কৃষি বাজেটে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সরকারের

অভিমন্যু গুহ

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে সবথেকে গুরুত্ব পেয়েছে কৃষি। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ ভারতের অর্থনৈতিক ভিতকেই মজবুত করবে। কারণ বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার খরচ বেড়েছে, রোজগারও ঊর্ধ্বমুখী। তাই টাকার দাম পড়েছে। কিন্তু কৃষকের রোজগার বাড়ার উপায় ছিল না। ঠিক এই জায়গাতেই আঘাত হানতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। সামনের গ্রীষ্মে উৎপাদিত খরিফি শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন মূল্যের তুলনায় পঞ্চাশ শতাংশ বেশি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, নীতি আয়োগ এ ব্যাপারে যে প্রমাণিত প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ব্যবহার করতে চলেছে তাতে কৃষকেরা উপকৃত হবেন।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে এভাবে বেঁধে দেওয়া অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে অর্থনীতিজ্ঞরা মনে করেন। অতীতে দেখা গেছে খোলা বাজারে চিনির কেজি চল্লিশ টাকা, অথচ চাষি আখের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বেঁধে দেওয়ায় এই সম্ভাবনা রোধ করা যাবে, তবে ফড়েরাজ খতম করতে রাজ্যেরও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কেন্দ্র সামগ্রিকভাবেই এবারের বাজেটে কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাজেটে কৃষি-বরাদ্দ প্রায় সাড়ে বারো শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৫৮ হাজার ৮০ কোটি টাকা। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রাও বাড়ানো হয়েছে প্রায় দশ শতাংশ— ১১ লক্ষ কোটি টাকা। এর ফলে নিম্নবিত্ত ও মাঝারি আয়ের কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন।

ফড়েরাজ বন্ধ করতেও কেন্দ্রের ভূমিকা এবারের বাজেটে ঐতিহাসিক। বাইশ হাজার গ্রাম্য হাটকে গ্রামীণ কৃষি বাজারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে কৃষকেরা সরাসরি খুচরো ও পাইকারি খরিদ্দারের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ পাবেন। জেটলি বলেছেন : 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়েই কেবল দায়িত্ব শেষ করছে না সরকার। এর সুযোগ যাতে কৃষকেরা পূর্ণমাত্রায় পেতে পারেন, সে দিকেও তীক্ষ্ণ নজর থাকবে সরকারের।' খরিফ শস্যের পরে বর্ষার সময় রবি শস্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের এই নীতি বজায় থাকবে বলে জেটলি জানিয়েছেন। কীভাবে এই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হবে, সে বিষয়েও সরকার ভাবনা-চিন্তা করছে বলে সূত্রের খবর।

সরকারি বরাদ্দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষি-বাজার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০০০ কোটি টাকা, মৎস্য ও প্রাণী বিকাশের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা, জাতীয় বাঁশ মিশন পুর্ননির্মাণের জন্য ১২৯০ কোটি টাকা, ভেষজ উদ্ভিদের জন্য ২০০ কোটি টাকা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা। এই বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে কৃষির হাল উন্নত করবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও কৃষি-বিষয়ক অন্যান্য বাজেট প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে, বিশেষ উৎপাদনের জন্য জেলায় ক্লাস্টার মডেল, কৃষকদের কাছ থেকে সৌর-শক্তি কিনতে রাজ্যগুলির উদ্যোগ, কৃষক ও চাষিদের জন্য সহজ কিস্তিতে কৃষি-ঋণ, জৈব-কৃষির বিকাশ, মহিলা কৃষকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ এবং কৃষক-প্রদাতা সংস্থাগুলির জন্য করের বিশেষ সুবিধা। সব মিলিয়ে এবারের বাজেটে সরকারের কৃষি-ক্ষেত্রে বাড়তি উদ্যোগ যে দেশের অর্থনীতির হাল ফেরাতে কার্যকরী পদক্ষেপ তা অস্বীকার করছেন না কেউই। তবে 'নুন বেশি হলে মাছের তরকারি রান্নাটা খারাপ হতো' বলে বিরোধী ও একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম বালিতে মুখ গুঁজছে।

এক নজরে এবারের কৃষি-বাজেট :

১। সামনের গরমকালে খরিফ শস্য ও বর্ষাকালে রবি শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উৎপাদন-মূল্যের পঞ্চাশ শতাংশ বেশি হবে। ২। কৃষি বরাদ্দ ৫৮ হাজার, ৮০০ কোটি টাকা। গত বারের থেকে ১২.৬ শতাংশ বেশি। ৩। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১১ লক্ষ কোটি টাকা। গতবারের থেকে ১০ শতাংশ বেশি। ৪। ২২ হাজার গ্রাম্য-হাট গ্রামীণ কৃষি বাজারে রূপান্তরিত হবে। ৬। কৃষি-ঋণের সহজ কিস্তি মিলবে। ■

ডিজিটাল ইন্ডিয়া : সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত

নরেন্দ্র মোদীর সরকার গত চার বছরে সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ধারে ও ভারে ডিজিটাল ইন্ডিয়া সব থেকে উজ্জ্বল। সরকারের লক্ষ্য তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমদানি শূন্যে নামিয়ে আনা। ইতিমধ্যেই সরকার ঘোষণা করেছে ২০১৯ নাগাদ দেশের ২.৫ লক্ষ গ্রামে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা পৌঁছে যাবে। ৪ লক্ষ ইন্টারনেট অ্যাকসেস ইউনিট তৈরি হবে। আড়াই লক্ষ স্কুল এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যাবে ওয়াই-ফাই পরিষেবা। সব থেকে বড়ো কথা, ১.৭ কোটি প্রশিক্ষিত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী পাবে দেশ। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্প অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছে। সারা দেশে তৈরি হয়েছে ৮.৫ কোটি ই-গভর্নেন্স পরিষেবা কেন্দ্র। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে ভারত শীঘ্রই অগ্রগণ্য ভূমিকা নেবে। ইতিমধ্যেই ডিজিটাল লকার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই লকারে প্যানকার্ড, পাসপোর্ট, মার্কশিট এবং ডিগ্রির সার্টিফিকেট সুরক্ষিত থাকে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কাগজের ব্যবহার যথাসম্ভব কমানো। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি এজেন্সির প্রশাসনিক ভার কমানোর ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সুবাদে প্রাপ্ত বিভিন্ন পোর্টালগুলির কথা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

কৃষক পোর্টাল :

পোর্টাল হলো সেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞরা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষক পোর্টালে কৃষি, পশুপালন এবং মৎস্য চাষ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। কৃষক তার মাতৃভাষাতেই পোর্টালে দেওয়া তথ্য পড়তে পারেন। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকও পোর্টালটি ব্যবহার করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেসব কৃষক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারাই আপাতত পোর্টালের সুবিধা পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

ডাক পোর্টাল :

ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা এই পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইন পরিষেবাগুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য আদানপ্রদান করে। গ্রাম ও শহরের মানুষ মোবাইলে বা কম্পিউটারে দেখে নেন নতুন কী পরিষেবা বাজারে এল। ভারতের যে কোনও ভাষায় অনুবাদযোগ্য পোর্টালটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

শস্য সংরক্ষণ :

ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণ, কৃষকদের কাছে খুবই দুরূহ সমস্যা। কোন

পোকামাকড়ের জন্য কী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে তার যাবতীয় তথ্য এই পোর্টাল থেকে মেলে। শুধু তাই নয়, শস্য সংরক্ষণে আগাম কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এই পোর্টাল তাও জানায়। বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত দেন। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকেরা সরাসরি বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ পেয়ে থাকেন।

ইনফোসেক পোর্টাল :

সাইবার অপরাধ এখন দেশে ক্রমশ বাড়ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক লেনদেন করার ব্যাপারে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন জরুরি সেই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলে ইনফোসেক সচেতনতা পোর্টাল। ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে, তথ্যের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া একটি সুবিশাল প্ল্যাটফর্ম। মানুষের জীবনের হাজারো সমস্যা এবং তার সমাধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই প্ল্যাটফর্মে। দু-একটি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো। মোদী সরকার এই প্রকল্প সম্বন্ধে আশাবাদী। শুধু সরকারই নয়, সারা বিশ্ব আশাবাদী। সেই আশা পূরণের লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে ভারত— ডিজিটাল ভারত। ■

এই সময়

স্বর্ণমন্দিরে করসেবা

ভারত সফররত কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডেয়ু সস্ত্রীক অমৃতসর ঘুরে এলেন। সেখানে

স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে তাঁরা প্রার্থনা করেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী সফি ট্রুডেয়ু স্বর্ণমন্দিরের লঙ্গরখানায় রুটি তৈরি করে সকলকে খাওয়ান।

রেলের ভাষা

ইংরেজি বা হিন্দি যাঁরা জানেন না সর্বভারতীয় চাকরির পরীক্ষায় তাঁরা মুশকিলে পড়েন। তাই

রেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে চাকরিপ্রার্থীরা যে-যাঁর মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবেন। ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এই নিয়ম। জানিয়েছেন পীযূষ গোয়েল।

পাশে আছি

উদ্যোগ নিয়েছিল সুন্নি সোশ্যাল ফোরাম। তাদের দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছে আরও

৩০টি সামাজিক সংগঠন। এরা সকলেই চায় অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হোক। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের সঙ্গে এক বৈঠকে মুসলমান নেতারা এই কথা জানিয়েছেন।

সমাবেশ -সমাচার

সংস্কার ভারতীর নতুন নাটক 'নর-নারায়ণ'

গত ২৬ জানুয়ারি তপন থিয়েটারে এক জমজমাট কাব্যনাটক 'নর-নারায়ণ'-এর প্রথম মঞ্চায়ন হয়। নাটকটি নির্দেশনা, সম্পাদনা ও সামগ্রিক পরিকল্পনায় ছিলেন সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের নাট্যপ্রমুখ সুকুমার পতি এবং প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণে ছিলেন মদনমোহন মল্লিক। মূল রচনা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ১৯২৫ সালে 'কর্ণ' নামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্য নাটক রচনা করেন। ১৯২৬ সালে 'নর-নারায়ণ' নামে এই নাটক নাট্যাচার্য শিশির কুমারের পরিচালনায় এবং কর্ণের ভূমিকায় অভিনয়ে নাট্য মন্দির লিমিটেড কর্তৃক সমাদৃত হয়। রাধেয় পরিচয় সত্য হলে তাঁর জীবনে পরশুরামের অভিশাপ কার্যকরী হতো না। পুরুষকারকে অতিক্রম করে নিয়তির প্রাধান্যই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে।' দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণ লোকরক্ষা, রাজরক্ষা, ধর্মরক্ষার জন্য সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবগণ

ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুদ্ধের পক্ষে সম্মতি দেন ও পাণ্ডবগণকে ন্যায়যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। কর্ণ সহজাত কবচ কুণ্ডলধারী অন্যায় অধর্মের সঙ্গী হওয়ায় তাঁর পতন ঘটেছে। এই ছিল নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নাটকের প্রস্তাবনায় কর্ণের অভিশাপ, একদিকে কৌরব-পাণ্ডবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যদিকে কৃষ্ণের সুচতুর ভূমিকা— নাটকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কুশীলবগণ খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পোশাক ও রূপসজ্জা ছিল মানানসই। কিন্তু আলো ও ধ্বনির প্রয়োগ যথাযথ ছিল না। এতদ্ সত্ত্বেও এরকম একটি দুঃসাহসিক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সংস্কার ভারতী প্রশংসার দাবি রাখে।

মালদহের বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে মাতৃ-পিতৃ পূজন দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি মালদহে বাচামারী গভ: কলোনির বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের শিক্ষার্থী ভাই-বোন ও আচার্য-আচার্যা দ্বারা মাতৃপিতৃ পূজন দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সংস্কৃত প্রমুখ বিজয় গণেশ কুলকার্ণী, উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সভাপতি বিশ্বনাথ গরাই। এছাড়াও গৌড়বঙ্গ ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড় ও মালদহ মহাবিদ্যালয় এবং স্থানীয় ৪টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং মা সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। খোলা প্রাঙ্গণে শিশু মন্দিরের ভাই-বোনেরা তাদের পিতা-মাতাকে বিধিবদ্ধ পূজা করে প্রণাম নিবেদন করে। বিদ্যালয়ের আচার্য-আচার্যারাও তাঁদের পিতা-মাতাকে পূজা করেন। পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে যথার্থ মানুষ হওয়া যায় না। বর্তমান এই ভোগসর্বস্ব সমাজে

এই সময়

শীতের অলিম্পিক

শীতকালীন অলিম্পিকের খবর খুব বেশি মানুষ রাখেন না। নরওয়ের মারিট জোয়েরজেন

শীতের অলিম্পিকে ১৪টি পদক জিতে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। সাফল্য এসেছে বায়াথেলন, ক্রস কান্ট্রি এবং স্কি স্প্রিন্টে। ৩৭ বছর বয়েসি অ্যাথলিট অভিভূত।

মিউনিসিপ্যাল বন্ড

শুনলে মনে হবে আজগুবি! হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বাজারে দু'শো

কোটি টাকার বন্ড ছেড়েছে এবং এই বন্ড বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যেই এই উদ্যোগ। এই ধরনের প্রয়াস ভারতে এই প্রথম।

আদালতে মুক্তি

ইশরাত জাহান এনকাউন্টার মামলায় (২০০৪) অভিযুক্ত গুজরাটের সেই সময়কার ডিজিপি

পি পি পাণ্ডেকে ছেড়ে দিল বিশেষ সিবিআই আদালত। প্রমাণাভাবে আদালতের এই সিদ্ধান্ত। ইশরাত জাহান-সহ তিনজনকে অপহরণ এবং হত্যার অভিযোগ ছিল পি পি পাণ্ডের বিরুদ্ধে।

পিতামাতাকে অশ্রদ্ধা করা, ব্যক্তিস্বার্থ এবং আত্মস্বার্থে নিমগ্ন থাকার প্রবণতা বাড়ছে। সমাজের পক্ষে এই মনোভাব বড়ই ক্ষতিকর। সমাজকে এই অসুখ থেকে মুক্ত করতে এবং শিশুদের শৈশব থেকেই পিতামাতা এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতেই শিশুমন্দিরের এই পিতৃ-মাতৃ পূজন অনুষ্ঠানের আয়োজন। বুধবার পিতৃ-মাতৃ পূজনের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রতিটি অভিভাবক বলেছেন— এই ধরনের অনুষ্ঠান অভূতপূর্ব।

প্রতি বছরই যেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়— সেই অনুরোধও তাঁরা করেছেন। এই সুন্দর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে স্থানীয় বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, সব বিদ্যালয়েরই উচিত এই বিষয়ে শিশু মন্দিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

'সক্ষম'-এর কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ৩-৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কল্যাণ ভবনে সক্ষমের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ সুকুমার এবং কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য তথা মূক ও বধির প্রকোষ্ঠ প্রমুখ কমলাকান্ত পাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। ৫টি জেলার ২৫ জন প্রতিনিধিত্ব কার্যকর্তা বর্গে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এই বছর 'সক্ষম' দশম বর্ষে পা দিয়েছে। প্রতিটি প্রদেশে সংগঠনের কাজ অগ্রগতির পথে, ইতিমধ্যে সারা দেশে ৭৫০ জেলায় কাজ শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জেলায় কাজের সূত্রপাত করা যায়। সভায় কেন্দ্রীয় সংযোজক

অরুণ বাজোরিয়া নতুন সমিতি ঘোষণা করেন। সভাপতি : ডাঃ সনৎকুমার রায়, সহ-সভাপতি : অরিন্দম উপাধ্যায়, সম্পাদক : অনিখ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক : অমরজিৎ বসু, কোষাধ্যক্ষ : মানিক দাস, সদস্য : অজয় বিশ্বাস, অরবিন্দ পাত্র, বিশ্বরূপ ঘোষ, সত্যনারায়ণ আগরওয়াল, মৃন্ময় ঘোষ, বন্দনা আঢ্য।

এই সময়

বোকো হারাম

নাইজিরিয়ার কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন বোকো হারাম ৮০ জন স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করেছিল। তাদের সকলকেই উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে

সে দেশের সেনা। সুত্রের খবর, জঙ্গিরা দাপচি শহরে ঢুকে এলোপাথারি গুলি চালিয়ে তাদের তুলে নিয়ে চলে যায়। নির্দেশ পাওয়ামাত্র সেনা ঝাঁপিয়ে পড়ে। আপাতত সবাই খুশি।

সমরসতা কুম্ভ

মধ্যপ্রদেশের রায়সেন জেলার হিন্দুরা স্থানীয় দশহরা ময়দানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি জাতপাত, লিঙ্গ, বয়েস নির্বিশেষে জেলার

হিন্দুরা ময়দানে সমরসতা কুম্ভে অংশগ্রহণ করে। স্বাগত ভাষণ দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনি।

অবনী চতুর্বেদী

অবিশ্বাস্য! ফ্লাইং অফিসার অবনী চতুর্বেদী ফাইটার বিমান চালানোর যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তিনি একাই এই বিমান চালাতে পারবেন। সম্প্রতি মিগ-২১ শ্রেণীর বিমান

কোনও সহকারী ছাড়াই চালান। তিনি ভারতীয় বিমানবাহিনীর জামনগর ঘাঁটিতে কর্মরত।

সমাবেশ -সমাচার

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ জেলার বার্ষিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর বাবুপাড়া সরস্বতী শিশু মন্দিরে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, রাজ্যসম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত এবং রাজ্য কোষাধ্যক্ষ গোপীনাথ চক্রবর্তী। অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী ভক্তিময়ানন্দজী মহারাজ। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কাশিমবাজার মহাজন সমিতি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দুর্গাদাস

রায়চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক সমর রায় এবং বহরমপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক রঞ্জিত মণ্ডল। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ৩৬ জন শিক্ষক- শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

শিবপুরে কল্যাণ আশ্রমের দান সংগ্রহ শিবির

বিগত বছরের মতো এবারও শিবপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র মন্দিরতলা অঞ্চলের রাস্তায় পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের শিবপুর শাখার উদ্যোগে পৌষ-সংক্রান্তির দিন আয়োজন করা হয় দান-সংগ্রহ শিবিরের। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলে। এই শিবিরে পৌরাণিক কাহিনি থেকে শুরু করে দান-সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও দিনটির তাৎপর্য সুচারু রূপে বর্ণনা করেন কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রাখেন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার নাগ, স্বপন কুমার নাগ। প্রভূত অর্থ ও দ্রব্যাদি সেদিন সংগৃহীত হয়।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রয়াণ বার্ষিকী স্মরণ

গত ৪ ফেব্রুয়ারি শিবপুর শ্মশান ঘাটে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়াত প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ কেশব চন্দ্র চক্রবর্তীর ৩৯তম প্রয়াণ বার্ষিকী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ পাঠ করেন কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। মাস্টারমশাইয়ের লেখা 'তোমার কাছে জীবন দিব কথা দিলাম রাজার রাজা' গীতটি কনিষ্ঠ পুত্র বাণীব্রত চক্রবর্তীর গলায় অনুষ্ঠানে একটি অন্য মাত্রা যোগ করে। হাওড়া মহানগরের প্রাক্তন সহ-সঙ্ঘচালক সুশীল কুমার দলুই মনোগ্রাহী স্মৃতিচারণ করেন।

আয়ুষ্মান ভারতে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ হাস্যকর

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

সম্প্রতি পেশ হওয়া বাজেটই ছিল মোদী সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ২০১৯ সালে সাধারণ নির্বাচন নির্দিষ্ট থাকায় অনেকেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, এটি হবে সেই হিসেবে চূড়ান্ত জনমোহিনী বাজেট। একটা গুঞ্জন বেশ দানা পাকিয়ে উঠছিল এই বাজেটে। অর্থনৈতিক সংযমকে দূরে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী দু'হাতে জনতাকে মুফতে নানান প্রকল্পের ডালি খুলে বসবেন। অকাতরে বিতরণ করবেন সরকারি কোষাগারের ভাণ্ডার। বাস্তবে তা কিন্তু ঘটেনি।

সরকারের তরফে জলের মতো টাকা বিলানো যেহেতু হয়নি, সেই সুবাদে বহু বিরোধী রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলছেন, এর ফলে তাঁদের একটা লড়াই করার তুল্যমূল্য জায়গা পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা ঠিক কী ভুল সেকথা একমাত্র সময়ই বলতে পারবে। তবে এই ধরনের তাৎক্ষণিক মলম দিয়ে ব্যাধি উপশম করার চেষ্টা বরাবরের অতি চেনা বহু ব্যবহারে জীর্ণ পন্থা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই বাজেটে সমাজের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গলদায়ক কোনও প্রচেষ্টা নেই বা রাজনৈতিক কোনও অঙ্কও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন নেই।

সেই কারণে চিরাচরিত পন্থা ছেড়ে কি অপ্রচলিত পথ এই বাজেট অনুসরণ করেছে? সেদিকে একটু মনোনিবেশ করতেই হবে। যেমন ধরুন সব চেয়ে বড় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পটি যেখানে সমগ্র জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষের ওপর সরাসরি একটা বড় অঙ্কের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার প্রভাব পড়তে চলেছে। এই প্রকল্পকে কিছুটা বিদ্রূপ করে অনেকেই 'মোদী কেয়ার' বলে অভিহিত করে তৃপ্তি বোধ করছেন। কিন্তু এই প্রকল্প জন্মসূত্রেই বিপুল শোরগোল তুলে নানা অভিধায় ভূষিত হয়ে চলেছে। কেউ বলছেন বাস্তবে এটির রূপায়ণ সম্ভব নয় আবার কেউ বলছেন সত্যিই এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত।

প্রকল্পটি এখন সদ্য ভূমিষ্ঠ। এর বিস্তারিত রূপ ও পরিকল্পনা ক্রমশ প্রকাশ্য। তবুও এ পর্যন্ত বাজেট কাগজপত্রের মাধ্যমে যতটুকু বাইরে এসেছে তার ভিত্তিতে এর আলগা রূপরেখাটি নিয়ে আলোচনা, ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। কারুরই এই প্রকল্পের উচ্চাভিলাষ নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। কেননা এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে এটিই সর্ববৃহৎ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প বলে চিহ্নিত হয়েছে। অধিকাংশ সমালোচক বলছেন এটি আদতে অবাস্তব, সঙ্গে সঙ্গে এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিতান্তই কম। সত্যিই কি তাই? সাদা চোখে এক নজরে তেমনটা মনে হতেই পারে, তবে একটু নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যাবে এই প্রকল্পের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষুরধার ও উদ্ভাবনীমূলক পন্থায় তা সম্ভবও করে তোলা হয়েছে।

বাজেট ঘোষণার পরই কালবিলম্ব না করে কিছু পণ্ডিত ঘোষণা করে দিলেন এই প্রকল্প ৫০ কোটি লোককে হসপিটাল খরচ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাস্তবে ১০ কোটি পরিবার ৫ লক্ষ টাকা হাসপাতাল চিকিৎসা বাবদ পাওয়ার অধিকারী হবে। এরপরই বেশ কিছু টিভি চ্যানেলে পণ্ডিতরা পারস্পরিক তুমুল কলরব করতে লাগলেন যে, কত টাকা সরকারের এককালীন খরচ হবে? সেই টাকার পরিমাণ গগনচুম্বী। হিসেবটা এমনভাবে করা হলো যেন একই বছরে সমস্ত পরিবারই অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট টাকা দাবি করে বসবে। বাস্তবে কিন্তু একটি পরিবারের একজন বা দু'জন প্রত্যেক বছরেই অসুস্থ হয়ে কখনই হাসপাতালে দীর্ঘকালীন চিকিৎসা করাতে

"প্রকল্পটি এখন সদ্য ভূমিষ্ঠ। এর বিস্তারিত রূপ ও পরিকল্পনা ক্রমশ প্রকাশ্য। তবুও এ পর্যন্ত বাজেট কাগজপত্রের মাধ্যমে যতটুকু বাইরে এসেছে তার ভিত্তিতে এর আলগা রূপরেখাটি নিয়ে আলোচনা, ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। কারুরই এই প্রকল্পের উচ্চাভিলাষ নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। কেননা এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে এটিই সর্ববৃহৎ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প বলে চিহ্নিত হয়েছে।"

যায় না। আর সত্যিই যদি যেতে হয় তাহলেও সকলেই কিন্তু বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকা পুরোটাই নেবেন তা হতে পারে না।

এরপর এল তৃতীয় ধরনের বিরোধিতাটি, তা হলো বাজেটে বণ্টিত এই প্রকল্পে ২০০০ কোটি টাকা নিতান্তই নস্যি। সরকারের তরফে কিছু পরে ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যে, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিমার প্রদেয় প্রিমিয়ামের ৬০ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি দেবে ৪০ শতাংশ। সমালোচকরা জানালেন তাহলেও দু'জনের মিলিয়ে তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ কোটি টাকাও তো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তার কী হবে? এটা কি সত্যি? দেখা যাক, এর উত্তর কিছুটা হ্যাঁ কিছুটা না, কেননা এর মধ্যে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যে রাজনৈতিক মশলা দেওয়া হয়েছে সেটা হয়তো বিরোধীপক্ষ ঠিক মতো তল করতে পারেনি। সমালোচকরা দু'টি নতুন যুক্তি দিচ্ছেন— (১) বিমার প্রিমিয়ামের টাকা নীতি আয়োগের প্রতি পরিবার পিছু ১০০০ থেকে ১২০০ টাকার যে হিসেব ধরা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি হবে। (২) আর যদি নীতি আয়োগের আগাম হিসেব সঠিকও হয় তা হলেও প্রতি বছরে যে টাকা লাগবে তা ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা; ৩৩৩৩ কোটি টাকা কখনই নয়।

কিন্তু কী রাজনৈতিক সমালোচক কী সাধারণ আলোচক উভয়েই একটা মোদ্দা ধারণার বশবর্তী হয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন, কেউই কিন্তু বিস্তারিত হিসেব নিকেশে ঢোকেননি। সবচেয়ে বড় কথা যে অতিকায় মাপের বিমা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে যেখানে ৫০ কোটি উপভোক্তা উঠে আসতে চলেছেন সেখানে বিমা কোম্পানিগুলি মাথাপিছু কভারেজের হার বাজার চলতি হারের চেয়ে কী বিরাট পরিমাণ কম হবে তা চটজলদি হিসেব করে আন্দাজ করা যায় না। অন্ধ্রপ্রদেশে চালু থাকা 'রাজীব আরোগ্য যোজনা' প্রকল্পের ১০০০ রোগীর জন্য ব্যক্তি পিছু ১২০০ টাকা প্রিমিয়াম নেওয়া হয় ২ লক্ষ টাকা মূল বিমার জন্য। নীতি আয়োগ সেই ভিত্তিতে দীর্ঘ বিশ্লেষণের পর যে ৫ লক্ষ টাকা বিমার মাত্রায় অত বিপুল সংখ্যার পরিবারকে আওতাধীন করতে চলেছে সেখানে ১২০০ টাকা প্রিমিয়াম ন্যায্য বলেই ধরা হচ্ছে। দ্বিতীয় যুক্তি যে, রাজ্যের অংশটি ধরে নেওয়ার পরও একটা বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এর উত্তর বলা যায় এটা নিশ্চিত যে রাজ্যগুলি কখনই নির্ধারিত অক্টোবর ২০১৮ এর মধ্যে এই প্রকল্প চালু করতে পারবে না। কেননা সাধারণ মানুষের মতো এই প্রকল্পের আচম্বিতে ঘোষণা তাদের কাছেও একটা বড় সারপ্রাইজ, তাই তাদেরও গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে। কত টাকা তারা বরাদ্দ করতে পারবে সেটাও তাদের হিসেব নিকেশ করতে হবে। সেই কারণে আগামী বছরে কিন্তু মোদী কেয়ার খাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে বড়সড় টাকা বরাদ্দ করতেই হবে।

এই সূত্রে আরও নানান দিক নিয়ে চুলচেরা বিচার বিবেচনা করার দরকার আছে। যেমন— রোগীরা কত সহজ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট হাসপাতালগুলিতে প্রবেশাধিকার পাবে? কত সুচারুভাবে প্রকল্পটি এগোতে পারবে ইত্যাদি। বিগত কয়েক বছরে ছোট মাপে হলেও অনেক রাজ্যে ও কেন্দ্রীয়ভাবে এই ধরনের প্রকল্প চালু হয়েছে। তাদের রেকর্ড কিন্তু মিশ্র। তবু মানতেই হবে এর মধ্যে আশার সঙ্কেত আছে। কেননা বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে নজরে পড়ার মতো বৃদ্ধি ঘটেছে। সরকার এবার সেই ভূমিকার অংশীদার হয়ে জনগণকে তার সাধ্যের মধ্যে পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর। আধারের মাধ্যমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। যোগ্যতা সম্পন্নরাই সরকারি প্রকল্পের অংশীদার হতে পারছে। তাই এই ধরনের বড় প্রকল্পে হাত দিতে গেলে যে অতীতে বিপুল ঢাক ঢোল পিটিয়ে কাজে নামতে হতো এখন সে পরিস্থিতি নেই।

তবে বিজেপির একটা বড় ধরনের সুবিধে রয়েছে। দেশের যে যে রাজ্যগুলিতে তারা ক্ষমতাসীন সেখানে অতি দ্রুতগতিতে সফলভাবে এই প্রকল্প রূপায়িত করে দেখাতে পারলে মোদীর মতো অতি দক্ষ জনসংযোগ কর্তার পক্ষে সেই ফলাফল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তুলে ধরতে অসুবিধে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত রাজ্য সঠিক রূপায়ণ করছে না সেই সমস্ত বিরোধীর নাক তিনি অনায়াসে ঘষে দিতে পারবেন। ■

ধর্মনিরপেক্ষীরা এখন চুপ কেন?

৩১ জানুয়ারি ২০১৮, বুধবার শ্রীনগরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতি নাসির উল ইসলাম মন্তব্য করেছেন যে— 'ভারতে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের উচিত ভারতের মধ্যেই আলাদা মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করা।' তিনি আরও বলেছেন, ভারতে প্রতিটি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানাভাবে মুসলমানদের হেনস্থা করা হচ্ছে। লাভ জেহাদের নামে, গোরুপাচারের মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেছেন— গোষ্ঠী সংঘর্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানরাই। তাঁর আরও বিস্ফোরক প্রশ্ন— 'পাকিস্তান যদি ১৭ কোটি মুসলমানকে নিয়ে মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করতে পারে, তাহলে সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও কেন ভারতের মধ্যেই পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার ভারতীয় মুসলমানরা পাবেন না?'

এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়— ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিলাতফেরত ব্যারিস্টার কবি মহম্মদ ইকবালের সভাপতিত্বে এলাহাবাদ শহরে মুসলিম লিগ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি দাবি করে। ভারতে মুসলমানদের বৃহৎ রাজনৈতিক দল সর্বপ্রথম ধর্মের ভিত্তিতে দেশের সীমানা চিহ্নিতকরণের দাবি উত্থাপন করে : ''I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a Single State-Self-Government within the British or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims, at me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India." (Homeland for Muslim, Muhamad Iqbal, 29.12.1930, Allahabad)। ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে মুফতি নাসির উল ইসলামের মন্তব্যে।

এছাড়া মহম্মদ আলি জিন্নার হিন্দুদের প্রতি যেরকম হীন দৃষ্টি এবং ঘৃণা ছিল অতটা না বললেও মুফতির বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি। এ ব্যাপারে ইজমে সাহেব বলেছেন, ''The dominating feature in Mr. Jinnah's mental structure was his loathing and contempt of Hindus. He apparently thought that all Hindus were Sub-human creatures with whom it was impossible for the Muslims to live."

যার বাংলা দাঁড়ায়— 'মি. জিন্নার মন জুড়ে রয়েছে হিন্দুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও হীনদৃষ্টি। হিন্দুদের তিনি মনুষ্যেতর জীব মনে করেন এবং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের বসবাস অসম্ভব বলে বিশ্বাস করেন।' সুতরাং তিনি দেশভাগ না করিয়ে ছাড়বেন না। (ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ। শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্গবিভাজন ও পশ্চিমবঙ্গ— পৃ. ২৪২)

দীর্ঘ ৭০ বছর পর স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে আবার সেই ইসলামের পক্ষপুটাশ্রিত কালো ছায়া দেখা দিচ্ছে বলে অনেকেই মনে করছেন। অবশ্য মুফতিই প্রথম নন। এই তো কয়েকমাস আগে কলকাতার টিপুসুলতান মসজিদের প্রাক্তন ইমাম নুররহমান বরকতি হুংকার ছেড়ে বলেছিলেন, জিহাদ করব, বাংলাকে পাকিস্তান বানাব ইত্যাদি। তার আগে প্রাক্তন কমিউনিস্ট, বর্তমানে তৃণমূল বিধায়ক হাজি রেজ্জাক মোল্লা ধুয়ো তুলেছিলেন— ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী চাই। ঠিক সেই সোহরাবর্দির আমলে মুসলিম লিগের কথারই প্রতিধ্বনি। (বর্তমান ১৫.৭.১৪)।

অথচ এই সমস্ত বক্তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কলমচি এবং তথাকথিত সুশীল সমাজ যারা প্রতিনিয়ত মোদী, বিজেপি এবং আর এস এস-এর যে-কোনও বক্তব্য প্রসঙ্গে বিরোধিতার নামে অন্নবস্ত্র পরিত্যাগ করে

নাচানাচি করেন সেই ধর্মনিরপেক্ষ নামধারীরা এখন চুপ কেন? তাঁদের তহবিলে ইসলামিক ডলারের স্রোত থেমে যাবে বলে?

—মণীন্দ্রনাথ সাহা,
গাজোল, মালদা।

ধর্মনিরপেক্ষবাদী বুদ্ধিজীবী

ইদানীং এক শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিদীপ্ত কলমে বিজেপির বিরুদ্ধে 'উগ্র দেশপ্রেম' এবং 'হিন্দুমৌলবাদ' ইত্যাদি শব্দের ঝংকার রণবিক্রমে গর্জে ওঠে। মৌলবাদের অভিধানিক অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা নামক এক অলীক শব্দের একই বন্ধনীতে সেকুলারি বুদ্ধিজীবীরা তাদের মতাদর্শ খবরের কাগজের পাতায় পরিবেশন করা এখন নিত্যনৈমিতিক ব্যাপার। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর মুসলমানরা পেল পাকিস্তান আর অবশিষ্ট ভারত হয়ে উঠল ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরা সুযোগসন্ধানীদের লুটেপুটে খাওয়ার চারণভূমি। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের মতিগতি দেখে মনে হয় তাঁরা কেবল ৪৭-র স্বাধীনতা প্রাপ্তি দেখেছিলেন, ভারতভাগ দেখেনি। তাঁরা দেখেননি ভারত ভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্টে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর ঢল। তাঁদের একবারও ভাববার অবকাশ হয়নি ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলেই ওই ছিন্নমূল বুদ্ধিজীবীদের ঠাঁই হলো। কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এমনকী চলচ্চিত্র নির্মাতারা সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ পটভূমি এবং চরিত্র চিত্রণে মশগুল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বাঙালির অভিজ্ঞান' গ্রন্থের লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের উদ্ধৃতি টেনে লিখেছেন— ''তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় নাই— এখনও

কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল। —শত্রু কে? শত্রু আর নাই, ইংরেজ মিত্ররাজা।'' লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন এইখানেই শেষ করেনি। ১৬০ পৃষ্ঠার বইএ বিভিন্ন জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর লেখনী কেমন করে গর্জে উঠেছে আর একটা উদ্ধৃতি রাখছি--- ''বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট নন, তাঁর তাগিদ বিকলাঙ্গ, বিকৃত, অবক্ষয়ে অবরুদ্ধ আর্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। তাই তিনি লক্ষ্য করলেন না বাংলার জনজীবনে সর্বনাশা বিপর্যয়। মুসলমানরা শাসন, শোষণ করলেও সম্পদ বিদেশে পাচার করেনি। ইংরেজরা এসেছিল একেবারে লুঠেরা চরিত্রে। মুর্শিদাবাদের নবাবি সম্পদ লুণ্ঠন করে ক্লাইভ প্রেরণ করেছিল ইংলন্ডে। বাংলাদেশ শোষণের ফলে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের সূচনা এবং পৃথিবী জোড়া প্রতিষ্ঠার মুখ্য উপায় ছিল।'' ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীর মনোবীক্ষণ করছেন বিংশ শতাব্দীর তাঁরই স্বজাতীয় গোত্রধারী প্রাবন্ধিক। ইতিহাস কত পরিহাসপ্রিয় এই লেখনীর মধ্যে তা পরিস্ফুট। একবার স্মরণ করুন একদা 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থাঁ হামারা' গীতিকবিতাটির স্রষ্টা কাশ্মীরের তিনপুরুষ আগে সপ্রুবংশীয় ব্রাহ্মণ হতে ধর্মান্তরিত মুসলমান কবি মহম্মদ ইকবাল ইউরোপ ভ্রমণকালে দেশটিকে দেখে কেঁদে উঠে লিখে ফেললেন— ''উও নজর আতা হ্যায়, হেজাজে তহজীর কা মজার।'' সিসিলি এক সময় আরবের অধীনে ছিল, ইকবালের ভ্রমণকালে বিদেশি শাসিত রাজ্য ছিল। এই দুঃখে লিখলেন— তড়পা না উও তড়পান মেরা তকদির মে যা।'' তিনি নিজেকে বলেছিলেন, আমি হেজাজের পথে একজন অনুগামী। আরব দেশের মধ্যে হেজাজের গুরুত্ব হচ্ছে বেশি। কারণ মক্কা আর মদিনা মুসলমানদের এই দুটি তীর্থস্থান হেজাজের পথেই পড়ে। এক সময় বিদেশি মুসলমানরা তাঁর মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের সুন্দর শিল্পকর্ম ধ্বংসসাধন করেছে তার জন্য ইকবালের কোনও ক্ষোভ ছিল না। পাঁচ হাজার বছরের তাঁর পূর্বপুরুষকৃত কৃষ্টির ফসল এই 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থাঁ হামারা'। নিজের লেখা কবিতাটি বেমালুম ভুলে গেলেন! এই ইকবাল 'পাক' শব্দের স্রষ্টা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রবক্তা। তাঁর ভাবশিষ্য দু'পুরুষ আগে হিন্দু হতে ইসলাম কবুল হওয়া পাকিস্তানের স্থপতি মহম্মদ আলি জিন্না ৪৭-এ শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে বলেছিলেন— 'to day let every muslim also take this pleadge of sacrifice in the cause of national freedom. পাকিস্তান হলো একমাত্র মুসলমান রাষ্ট্র আর হিন্দুস্থান হলো একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যার কোনও রাষ্ট্রধর্ম নেই।' তাই আমাদের দেশের একজন স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী সাহিত্যিক এবং কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপচার্য তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'সময় : সমাজ : সাহিত্য' গ্রন্থের 'ওহ কারগিল' নিবন্ধে সগর্বে ঘোষণা করেন— ''কারগিল=দেশপ্রেম=হিন্দুত্ব=মুসলমান বিরোধিতা।'' কবি ইকবাল তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে এই পোড়া হিন্দুস্তানের মাটিতে শেষ শয্যা নিলেন। শেষ শয্যা পাতার জন্য পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিতে ফিরে যাওয়ার কথা কিন্তু ওই মেকি ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা ভাবতেও পারবেন না।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে লঘু ও গুরু চিহ্নিতকরণ অপ্রয়োজনীয়

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্মই সমান। কোনও বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসমূহকে বিশেষ সুবিধে দেওয়ার কথা নেই। আমাদের দেশে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু এবং মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, পার্সি ও জৈনরা সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মের বিষয়ে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হলে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিতকরণের কোনও যুক্তি নেই। আমার সাধারণ মতে এরূপ চিহ্নিতকরণ ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী। তবে যেসব রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ নয়, সেসব রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু বা লঘু সম্প্রদায়ের চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন আছে। যেমন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সরকারি ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এসব দেশে অ-ইসলামিরা সংখ্যালঘু। এই অবস্থায় ভারতে গুরু বা লঘু চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিক ও সাধারণ মানুষকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

হিন্দু হোস্টেলের নাম বদলের প্রস্তাব

সংবাদে প্রকাশ সুগত বসু হিন্দু হোস্টেলের নাম থেকে হিন্দু শব্দটি সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মতে এই হোস্টেলকে জাত, শ্রেণী, লিঙ্গ সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া উচিত। সুগত বসুর হিন্দু শব্দের উপর অত বিদ্বেষ কেন তার ময়না তদন্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিনি নেতাজীর নাতি হলেও বিবাহসূত্রে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য হামিদ জালাল সাহেবের কন্যা মোছাম্মৎ আয়েশা জালালের স্বামী। তিনি ইসলাম কবুল করেছেন কিনা আমার জানা নেই। সাধারণত কোনও হিন্দু যদি মুসলমান কন্যা নিকাহ্ করে তবে তাকে ইসলাম কবুল করতে হয়, যেমন হয়েছেন আমাদের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। ক্যাডার আমেদ আলির তালাক প্রাপ্তা সুরাইয়া বেগমকে নিকাহ করার জন্য ইসলাম কবুল করে ইফতিয়ার গনি হয়েছেন তিনি। সঙ্গীত শিল্পী কমল দাশগুপ্ত ফিরোজা বেগমকে নিকাহ কারার জন্য ইসলাম কবুল করে কমল আলি হয়েছেন। সঙ্গীতশিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায় সাবিনা ইয়াসমিনকে নিকাহ্ করার জন্য কবির সুমন হয়েছেন। সুগতবাবুর হিন্দু বিদ্বেষের একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি। গত ২১-৭-২০০০ আনন্দবাজারে শ্যামাপ্রসাদকে কটাক্ষ করে তিনি এক বিশাল প্রবন্ধ লেখেন 'বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তাকে বাঙালি কী চোখে দেখবে। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার না হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পথপ্রদর্শক? সারা বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করে বাঙালি জাতির সমূহ সর্বনাশ করেছিলেন কোনও কোনও মহলে তাদেরই পশ্চিমবঙ্গের রূপকার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।'

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

সবার রং মেলানোর উৎসব—দোল

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'দোল দেল-দুর্গোৎসব, তিন বাংলার উৎসব'। এই কথার মধ্যে প্রবাহিত বাংলার ধর্মসাধনার বিচিত্র রূপটি। আদিতে দোল ছিল বৈষ্ণবদের উৎসব, দেল অর্থাৎ চড়ক বা গাজন শৈব উৎসব আর দুর্গাপুজো শাক্ত উৎসব।

সূচনায় বাংলার তিন সম্প্রদায়ের আচরিত ধর্মের এই ত্রিবেণী ধারা ছিল মুক্ত। পরস্পর নিরপেক্ষ। কিন্তু পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক শক্তি পার হয়ে মুক্ত-ত্রিবেণী হয় যুক্ত-ত্রিবেণী। এই তিন উৎসবই হয়ে ওঠে বাংলার সব সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসব। বলা যায়, দোল-দেল-দুর্গোৎসব— বাংলার জাতীয় উৎসব।

বাংলায় যার নাম দোল, উত্তর ভারতে তাই আবার হোলি। পশ্চিম ও উত্তর ভারতেও পালিত হয় এই উৎসব। তবে ভিন্ন নামে, ভিন্ন রূপে। দোলের রং মাখামাখি ফাল্গুনের পূর্ণিমায়, কিন্তু উত্তর ভারতে প্রতিপদে অর্থাৎ একদিন পরে হোলি। পশ্চিম ভারতে এই উৎসব আবার চারদিন পরে, পঞ্চমীর দিন। তাই তো এর নাম রংপঞ্চমী। একদা যা ছিল প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই ধর্মীয় উৎসব, পরবর্তীকালে তার ধর্মীয় অনুষঙ্গে আসে একটি বিরাট বদল। তাই বা কেন, এই ধর্মীয় দিকটি চলে যায় প্রায় বিস্মৃতির আলো-আঁধারে।

সূচনায় বহ্ন্যুৎসব ছিল এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এবং সেটি হতো রং-খেলার আগের দিন। প্রাচীন নাম ছিল হোলকা বা হোলিকা। পুরাকাহিনি মতে, হোলিকা হলো দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বোন। ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণু ভক্ত। এই নিয়ে পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব। ছেলেকে কিছুতেই স্বমতে আনতে না পেয়ে রাজা শেষে তাকে বধ করার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় ব্যর্থ হয় হিরণ্যকশিপুর সব প্রয়াস। অবশেষে ডাক পড়ে হোলিকার। প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বসে হোলিকা। জ্বালানো হয় আগুন। কিন্তু হরির কৃপায় অক্ষত থাকে প্রহ্লাদ। হোলিকাই পুড়ে ছাই হয় সে আগুনে। সেই ঘটনার স্মরণেই হোলি উপলক্ষে এই আগুন উৎসব।

এই অনুষ্ঠানে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে হোলিকা অথবা ঢুন্ডার প্রতীক হিসেবে সব আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা হয়। আগুন জ্বেলে রক্ষোঘ্ন অর্থাৎ রাক্ষস রূপী সমস্ত অমঙ্গলনাশক মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনবার আগুন প্রদক্ষিণ করা হয়। গাওয়া হয় নানারকম গান।

মহারাষ্ট্রে নানারকম অশ্লীল কথা বলে হোলিকা রাক্ষসীর পুজো করা হয়। লোকের বিশ্বাস, গালাগালি বা কুৎসিত কাজে তুষ্ট হয় রাক্ষসী। বিনাশ করে সব অমঙ্গল।

দক্ষিণ ভারতে এই উৎসবকে বলা হয় কামদহন। বঙ্গদেশে এর নাম বুড়ির ঘর

পোড়ান বা চাঁচর। কোথাও কোথাও বলা হয় মেঢ়া পোড়ানো। দোলের আগের দিন খড়, পাটকাঠি ইত্যাদি দিয়ে একটা ঘরের মতো করা হয়। তাতে পিটুলির তৈরি একটা ভেড়া মূর্তি রেখে আগুন দেওয়া হয় সে ঘরে। এই ভেড়ার নাম মেঢ়াসুর বা মেণ্ঢাসুর। একেই মনে করা হয় শত্রু বা অশুভের প্রতীক। প্রার্থনা করা হয়, এই আগুনের ছাই বা বিভূতি যেন হয় ভূতিদা বা মঙ্গলদায়ক। এই ছাই, কাদা ও রং দিয়ে শুরু হয় পরদিন রঙের খেলা।

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই অগ্ন্যুৎসব আসলে নতুন শস্য ঘরে তোলার উৎসব। তাই ছোলা, গম ইত্যাদি নতুন শস্য আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার রীতি আছে। বঙ্গদেশে কোথাও কোথাও তেইরি নামে এক উৎসব হয় তেরোই ফাল্গুন। সে উৎসবে কৃষকরা এই ভাবে আগুনে নানারকম শস্য পুড়িয়ে তা খায়। বলা হয়, এই উৎসব প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দুষ্টদমনকারী ও রোগ শান্তির হোম বিশেষ। তাই এর নাম হোলিকা।

সে যাই হোক, বঙ্গদেশের দোল কিন্তু একটি বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান। এর প্রধান অঙ্গ ভগবান হরি বা বিষ্ণুর পূজা। এই অনুষ্ঠানের দু'টি অঙ্গ। প্রথমত, দোলায় বিষ্ণুকে বসিয়ে দোল দেওয়া হয়। সে কারণেই এর নাম দোল। দ্বিতীয় অঙ্গ ফল্গুৎসব। দেবতার অঙ্গে ফাগ বা আবির দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে কর্পূর সুবাসিত রক্ত-পীত-শুক্ল চূর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

দোলের পূজা পর্বের এই অনুষ্ঠানগুলি সাধারণ মানুষের কাছে এখন আর খুব বেশি পরিচিত নয়। বরং রং-খেলাটাই এখন মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর এই রং খেলা অনেক সময় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। তবে জলে গোলা রং খেলা হয় দুপুর পর্যন্ত। বিকেল থেকে শুরু হয় আবির খেলা। সেই সঙ্গে বসে নানা গান বাজনার আসর। বৈষ্ণব মন্দির, মঠ এবং বেশকিছু পারিবারিক মন্দিরে বসে কীর্তনের আসর।

দোলের এই যেসব অনুষ্ঠান, তা সম্ভবত খুব একটা প্রাচীন নয়। জীমূতবাহন, বৃহস্পতি রায় মুকুট, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতের স্মৃতিগ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মোৎসবের মধ্যে কিন্তু এর উল্লেখ নেই। বরং তাঁরা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চূতকুসুম অর্থাৎ আমের মুকুলের সঙ্গে জল পানের কথা বলেছেন।

তবে ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্বে' কিংবা ওই শতকেরই গোবিন্দানন্দের 'বর্ষ ক্রিয়াংকৌমুদী'-তে দোলযাত্রার উল্লেখ আছে। দোলযাত্রা সম্পর্কে ব্রহ্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের বচনের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তবে এই উৎসবটি পুরীর জগন্নাথ বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য, একথাও তাঁরা বলেছেন। বাংলার বৈষ্ণবদের স্মৃতিগ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাস'-এও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের দোলযাত্রার কথা বলা হয়েছে। বঙ্গদেশে চৈত্রমাসে এই উৎসব করার কথা বলা হয়েছে। মনে করা হয়, ওড়িশা থেকে দোল এসেছে বঙ্গদেশে। ব্রহ্ম পুরাণের উক্তি, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলাগত পুরুষোত্তম গোবিন্দকে দর্শন করলে গোবিন্দধাম প্রাপ্তি ঘটে।

এইসব উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয়, বঙ্গদেশে এই দোল উৎসব প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একটি ভূমিকা রয়েছে। নীলাচলে থাকার সময় জগন্নাথদেবের দোলযাত্রা দর্শন করে এই উৎসবটি পালনের জন্য বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদের নির্দেশ দেন এবং তার পর থেকেই দোল হয়ে ওঠে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদের অন্যতম মুখ্য অনুষ্ঠান।

কেউ কেউ অনুমান করেন, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশে দোল উৎসবের প্রচলন শুরু হলেও সম্ভবত ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্বেও তা সাধারণের উৎসব হয়ে ওঠেনি। কেননা, ঊনবিংশ শতকের ওই সময়কালে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে দোল সম্পর্কে কোনও বড়ো কোনও খবর দেখা যায়নি। ওই শতকের গোড়ার দিকে হিন্দুদের পালাপার্বণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা বিস্তৃত বিবরণ লিখে রেখেছেন পাদরি ওয়ার্ড। তাতেও দোলের কথা নেই।

এইসব ঘটনা থেকে অনুমান, ঊনবিংশ শতকের প্রথমমার্ধেও রং খেলা বা দোলের প্রচলন এই বঙ্গদেশে ছিল অত্যন্ত সীমিত। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বা তার পর থেকেই দোলের পূজা অনুষ্ঠান গৌণ হয়ে রং খেলাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই রং খেলা সম্পর্কে বলা হয়, দেবতারা স্বর্গে এই সময় রং খেলেন। তারই অনুকরণে মর্ত্যে মানুষের এই রং খেলা।

দোল বা হোলি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারই একটি রঙ্গ। বৈষ্ণব-পদাবলি এবং রসশাস্ত্রগুলিতে আছে গোপীদের রাধাকৃষ্ণের সম্পন্ন সম্ভোগের একটি প্রকারভেদ মাত্র। বিষ্ণু বা নারায়ণশিলায় ফাগ দেওয়ার সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাতেও বৃন্দাবনের অরণ্যে কদম্বতরুমূলে গোপগোপীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত গোবিন্দের কথা রয়েছে।

দোললীলার সঙ্গে বিশেষ করে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পেরও একটা যোগাযোগ রয়ে গেছে। দোলের জন্য বহু জায়গাতেই পাকা দোলমঞ্চ আছে। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এই মঞ্চের চারটি দুয়ার, ষোলটি স্তম্ভ। চূড়াটিও নানা রকম। দোলের সময় মঞ্চটি বিশেষভাবে সাজানো হয়। বিশেষ করে শোলার তৈরি কাকাতুয়া, হনুমান, ময়ূর ইত্যাদি মূর্তি দিয়ে মঞ্চটি সাজানো হয়।

দোলের দিন মন্দির থেকে রাধামাধব অথবা বিষ্ণুমূর্তি বা নারায়ণ শিলাকে মন্দির থেকে এনে এই দোলমঞ্চের সুসজ্জিত রত্ন দোলায় স্থাপন করা হয়, হয় বিশেষ পূজা অর্চনা। সেই সঙ্গে প্রতি বেলায় সাতবার করে মোট তিন পর্বে একুশবার দোল দেওয়া হয়। তিন পর্বের এই দোলের নাম যথাক্রমে দেবদোল, রাজদোল এবং নরদোল।

দোলের এই পূজা অনুষ্ঠানপর্বটি এখন প্রায় পারিবারিক বা মঠ-মন্দিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের আনন্দ রং খেলায়। আর তারই মাধ্যমে সারা ভারতে এটি এক সর্বজনীন মিলন উৎসবের রূপ নেয়। দোল এখন সবার রংয়ে রং মেলানোর উৎসব। ■

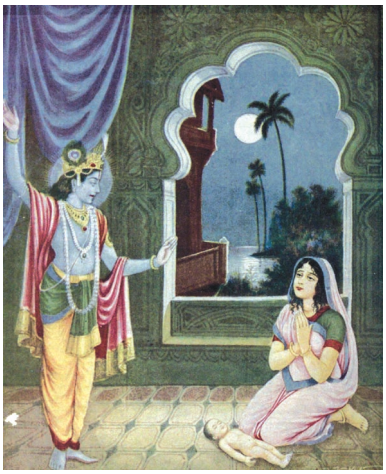

মহাভারতের অপ্রধান নারীচরিত্র উত্তরা

দেবপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারতে বিরাট, স্ত্রী ও আশ্রমবাসিক পর্বে উত্তরা চরিত্রের উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। মৎস্যরাজ বিরাটের ঔরসে ও মহারানি সুদেষ্ণার গর্ভে উত্তরার জন্ম। মহাভারতের বিরাট পর্বেই প্রথম উত্তরার উপস্থিতি। অজ্ঞাতবাস কালে পঞ্চ পাণ্ডব ছদ্মবেশে বিরাটপুরীতে প্রবেশ করে। অর্জুন বৃহন্নলারূপে বিরাট কন্যা উত্তরা ও তার সখীগণকে গীতবাদ্য শিখাতে লাগলেন। মহাভারতকার বিরাট কন্যা উত্তরার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— 'তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় তাঁর গাত্রবর্ণ, তাঁর দেহ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্ত। তাঁর চেহারা অত্যন্ত মনোহর, তাঁর নেত্রযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুন্দর।'

এরপর কৌরবগণ বিরাটরাজের গোধন হরণ করবার কালে সৌরন্ধ্রীর ইঙ্গিতে ও উত্তরের কথায় উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলারূপী অর্জুন উত্তরের রথের সারথ্য স্বীকার করে কৌরবদের বাধাদানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই যাত্রা বিষয়ে অবশ্যই বৃহন্নলার নিজের ইচ্ছা ছিল। এখানে যাত্রার প্রাক্কালে এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। কারণ উত্তরা তারুণ্যে উপনীত হলেও তার বাস্তব বুদ্ধি জ্ঞান তেমন পরিপক্ক ছিল না, তিনি শিশুর মতোই সরল ছিলেন। কারণ বৃহন্নলার যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন— ''হে বৃহন্নলে, তোমরা ভীষ্ম,দ্রোণ প্রভৃতি কুরু বীরগণকে পরাজিত করে তাদের সুন্দর উড়ানি ও বস্ত্রসকল আমাদের পুতুল খেলার জন্য আনবে।' তৎকালে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ কুরুবীরদের বীরত্ব ও খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া, তাঁদের হারিয়ে তাদের মনোজ্ঞ কাপড় পুতুল খেলার জন্য আনতে বলা নিতান্ত শিশুসুলভ ভাবনা সন্দেহ নেই। তবে বিরাটরাজের গোধন রক্ষা করে কুরুবীরদের হারিয়ে উত্তরার কথা স্মরণ করে তাঁদের বস্ত্র এনে বৃহন্নলারূপী অর্জুন উত্তরাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন।

এরপর পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের এক বছর অতিক্রান্ত হলো। সত্য প্রকাশিত হলো। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী আত্মপ্রকাশ করলেন। পুত্র উত্তরের মুখে মৎস্যরাজ বিরাট আগেই অর্জুনের বীরত্বের কথা শুনেছিলেন, এখন অর্জুনকে নিজ কন্যা উত্তরাকে দান করতে মনস্থ করলেন। ছাত্রী কন্যাতুল্য, তাই অর্জুন উত্তরাকে বিবাহ করতে অসম্মত হলেন। তবে তিনি উত্তরাকে নিজপুত্র অভিমন্যুর পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করে প্রস্তাব দিলেন এবং ওই প্রস্তাবে বিরাটরাজ সানন্দে সম্মতিদান করলেন। এরপর মহাধুমধাম সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে অভিমন্যুর সঙ্গে রাজকন্যা উত্তরার বিবাহ সুসম্পন্ন হলো।

উত্তরা ও অভিমন্যুর দাম্পত্য জীবন অধিককাল স্থায়ী হলো না। উত্তরার বিবাহের মাত্র ছ' মাসের মধ্যেই শুরু হলো কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে অভিমন্যু সপ্তরথী দ্বারা আবদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। ওই সময় উত্তরা ছিলেন সন্তানসম্ভবা। যুদ্ধে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে বিদ্ধ করল। স্ত্রীপর্বে মহাভারতকার দেখিয়েছেন উত্তরার দুর্ভাগ্যের যেন শেষ নেই। শ্মশানে নিজ পতির ক্ষতবিক্ষত শব দেখে উত্তরা যেভাবে বিলাপ করেছেন তা বোধকরি সকলকেই স্পর্শ করেছে। এরপর অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রাক্কালে উত্তরা এক সন্তান প্রসব করলেন। পাণ্ডবগণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মঙ্গল শঙ্খ বেজেই থেমে গেল। কারণ উত্তরা যে সন্তান প্রসব করেছে তা মৃত। অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য নিমন্ত্রিত শ্রীকৃষ্ণ তখন হস্তিনায় উপস্থিত ছিলেন। অন্তঃপুরে পুরনারীদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। ক্রন্দনধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে সাত্যকিকে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে পুরনারীগণ বিশেষত কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা কাঁদতে লাগলেন। কৃষ্ণ সূচিকাগৃহে প্রবেশ করতেই উত্তরা কেঁদে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন— ''হে বার্ষ্ণেয়, হে মধুসূদন, হে বীর, তোমার শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রার্থনা করছি— দ্রোণপুত্রের অস্ত্রদগ্ধ আমার পুত্রটির প্রাণ দান করুন। প্রভো! মনে ছিল, পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব। আমার সেই আশা বিফল হলো। আপনার ভাগ্নেয়র এই দশা দেখুন।'' এই কথা বলে উত্তরা বারবার প্রার্থনা জানাতে জানাতে মূর্ছিতা হলেন ও তাঁর দুঃখে সকলেই বিলাপ করতে লাগলেন।

এর অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হলেন এবং তাঁর যোগ ও বিভূতি প্রভাবে মৃতশিশুর শরীরে প্রাণসঞ্চার হলো। উত্তরা পুত্রকে কোলে নিয়ে তখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। পরীক্ষিণ বংশজাত বলে শ্রীকৃষ্ণ ওই পুত্রের নাম রাখলেন পরিক্ষিৎ'। কেউ কেউ বলেন মাতৃজঠরেই তাঁর ভগবৎ দর্শন হয়েছিল, জন্মানোর পরে তিনি সেই বিরাট পুরুষকে অবলোকন করতে চাইতেন বলে সকলকেই পরীক্ষা করে দেখতেন তাই তিনি পরিক্ষিত। আর বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত বা প্রাণপ্রাপ্ত তাই তিনি পরিক্ষিত, তাই তিনি 'বিষ্ণুরাত'।

এরপর মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্বে আমরা শেষ উত্তরাকে লক্ষ্য করি, বনাশ্রমে অবস্থানকারী কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীদের দেখবার জন্য সকলের সঙ্গে উত্তরাও উপস্থিত হয়েছেন। ওই আশ্রমেই মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় তিনি তাঁর পরলোকগত পিতা মৎস্যরাজ বিরাট, ভ্রাতা ও স্বামীর দর্শন লাভ করে কৃতার্থা হন। লক্ষণীয়, মহর্ষি ব্যাসের কৃপাতেই তৎকালে গঙ্গায় ডুব দিয়ে তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন। ■

অরুণিমা সিনহা

আত্মবিশ্বাস মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

সুদর্শনা চক্রবর্তী

ভয়ের আবার লিঙ্গভেদও হয়। অবাক হওয়ার কিছু নেই। যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এখনও মহিলাদের দেখা হয় পুরুষের অধীনস্থ হিসাবে আর তাদের নিজেদের অধিকারের জন্য এখনও অবিরাম লড়াই চালিয়ে যেতে হয়, সেখানে তাদের যে সম্পূর্ণ নিজেদের কিছু ভয় নিয়েও বাঁচতে হয় সে আর বড় কথা কী! এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভয় নিঃসন্দেহে যৌন হেনস্থা, যৌন নির্যাতনের ভয়। তার বাইরেও রয়েছে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়, নিজের মৌলিক অধিকারটুকু হারিয়ে ফেলার ভয়। এইসব ভয় নিয়েই বেঁচে থাকতে হয় মেয়েদের। যেমন ফিনিক্স পাখি প্রতিবার পুড়ে যাওয়ার পরও নতুন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে, যুঝে যায়। মেয়েরাও যারা ফিরে আসতে পারে না, তাদের হয়ে লড়াইটা লড়তে শুরু করে অন্য কোনও মেয়ে, আরও অনেক মেয়ে। সঙ্গে থাকে—সাহস।

সাহস— তিনটে বর্ণের এই ছোট্ট শব্দটার কিন্তু অনেক জোর। ছোটবেলায় ভয় পেলে অভিভাবকেরা অনেক সময়েই বলেন সাহস করে অন্ধকারটুকু পেরিয়ে এস, সাহস করে একবার চোখ মেলে তাকাও— অনবরত এই সাহস পেতে থাকাটা জরুরি। ওই অন্ধকারের ভয় ছোটবেলায় কার না থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অনেক ক্ষেত্রেই চলে যায়, অনেক সময়ে যায় না। কিন্তু কেন? কারণ আমরা ভাবতে থাকি, ওই অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এমন কিছু যাকে আমরা দেখতে পারছি না, চিনতে পারছি না। অন্ধকার থেকেই আমাদের যেতে হবে আলোয়।

বিপদ, দুর্বিপাক আসতেই পারে। আমাদের দাবিটা যেন হয়— 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'। জীবন কারওরই মসৃণ নয়, সেখানে থাকতেই পারে এমন বহু কিছু যা আমরা আগে থেকে আঁচ করতে পারি না, ঘটতে পারে এমন কিছু যা হয়তো আমাদের ভাবনারও অতীত। যখন বিধ্বস্ত হয়ে যায় মেয়েরা। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর অপর নামই তো জীবন।

মহিলাদের মনে রাখতেই হবে যে ভয় পেলে, এগিয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেললে, আদপে কোনও লাভ হবে না। জীবন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও কোনও লাভ নেই। যদি পালিয়ে যাই, যদি জীবন থেকে ছুটি নেওয়ার কথা ভাবি, তাহলে আমাদের ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জন ছাড়া আর কারই বা কী ক্ষতি হবে। হেরে যাব আমরাই, একটিবার মাত্র যে দুষ্প্রাপ্য জীবন পাই, তা কি শুধু ভয় পেয়ে হারিয়ে ফেলব? তার অপার সৌন্দর্যটুকু, তার নিজস্বতাটুকু উপভোগ করতে হলে সেই মানুষগুলোর কথা একবার ভেবে দেখতে হবে, যাঁরা জীবনের কঠিনতম পথ পেরিয়ে আসেন হাসি মুখে। যাঁদের সামনে এসে জীবনও মুচকি হাসে। তাঁদেরও ভয় দেখানোর কম প্রচেষ্টা করা হয় না, কিন্তু তারা সেই চেষ্টার সামনে মাথা নোয়াতে নারাজ।

সেই অরুণিমা সিন্‌হা, যিনি একটি পা হারিয়েও এভারেস্টে ওঠেন, সেই দৃষ্টিহীন মানুষটি যিনি বেঁচে থাকেন স্বাভাবিকতমভাবে প্রতিবন্ধকতা নিয়েও, যে রূপান্তরকামী মানুষটি সমাজের ভ্রূকুটি পেরিয়ে নিজের জীবন নিজের শর্তে বাঁচেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ভয় পেরিয়ে আসেন। আসলে ভয় পেরিয়ে আসার জন্য কাউন্সেলিং বা আলোচনার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। মন শান্ত করার জন্য যোগাভ্যাস, ধ্যানের মতো উপায়ও রয়েছে। তবে যাই করা হোক না কেন, তা নিজেকেই করতে হবে। আমার, আপনার হাত ধরে কেউ তা করে দেবে না। ভয়টা যেমন নিজেই পাচ্ছি, তেমন তা থেকে নিজের মতো করে মুক্তির উপায়ও নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। সঙ্গে রাখতে হবে অযুত-নিযুত সাহস। এই সাহস হারিয়ে ফেললে চলবে না কোনওভাবেই। আতঙ্কে কেউ ভালো থাকে না। ভালো থাকার জন্য সাহস লাগে, সেই সাহস কোনও পরিস্থিতিতে হারিয়ে ফেললে চলবে না। ভয় যেই হামাগুড়ি দিয়ে পাশে আসতে চাইবে, গলা ছেড়ে বলতে হবে 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দু'বেলা মরার আগে মরব না'। ■

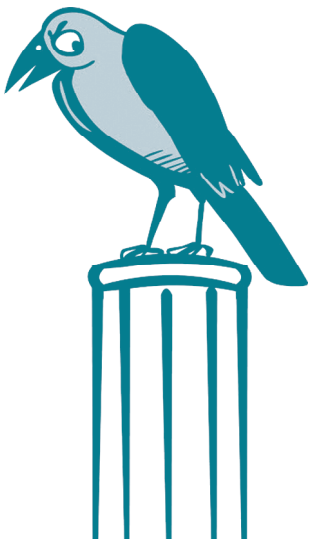

এই দুরন্ত চক্রের লেগেছে পাক

কত আশা নিয়ে বসে আছি চক্রে তুলে নাও। একবার চক্রে চড়তে পারলে তার দোলায় দুলে দুলে আপনারে যাব ভুলে। মাটির মানুষ হলেও আকাশে হাত বাড়াবো কার পানে, সেটা অবশ্য জানা। কেননা বামনের চিরকালের অভিলাষ চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো। বাংলার এক কবি একদা লিখেছিলেন, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। সেসব অনেক কাল আগেকার কথা। বর্তমানে বঙ্গবিভীষণ কবির দৃষ্টিতে পূর্ণিমার চাঁদ যেন একটি বিটকয়েন এবং চাঁদের পাহাড় হলো, 'নায়ক' সিনেমায় দেখা কয়েনের পাহাড়। সেই জন্যেই বোধ হয় চক্রের নাগরদোলায় চড়ার জন্যে সকলের এত হাপিত্যেশ করে বসে থাকা।

যাক, অবশেষে সেই শবরীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কালগুনে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে। এসেছে সংবাদ এতদিন যা ছিল সুদর্শন চক্রের মতো অপ্রত্যক্ষ, সেটি এখন সুপ্রত্যক্ষ করার জন্য নির্মাণ প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। টাকার জন্যে কোনও ভাবনা নেই, জনগণের কোনও ভালো কাজের জন্য বা গণমুখী কোনও উৎসবের জন্য কোনওদিন টাকার অভাব হয়নি, হবেও না। সে শিক্ষকদের মাইনে বা পেনশন পেতে দেরিই হোক, আর সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য পেতে একটু ঝামেলাই হোক। কিন্তু মানুষের জীবনের প্রাণভোমরা উৎসবকে বাদ দিয়ে জীবন চলতে পারে না।

তাই একথা নিশ্চিত যে, এই চক্রোৎসবের জন্যে অর্থের কোনও অভাব সহ্য করা হবে না। চক্রের আবর্তন সকলে দেখবে যখন, তখন ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।

লন্ডনে টেমস নদীর তীরে এরকম একটা চক্র আছে বটে। মজা হলো, সেটা চড়লে নীচু থেকে বেশ উঁচুতে ওঠা যায় ঠিক আমাদের দেশের রাজনীতির মতো। আজ অশিক্ষিত পার্টির রাজনীতিতে রাস্তায় রাস্তায় পার্টির ঝান্ডা হাতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছো, চক্রের পরিবর্তনে দেখা গেল হঠাৎ ওপরে উঠে গদিতে বসে গণমুখী নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে লেকচার ঝাড়ছো। জীবনের সরল গতি বা বক্রগতি কোনওটি দিয়েই এই মাহাত্ম্য লাভ করা যায় না, একমাত্র চক্রগতি ছাড়া। জীবনের সেই মহাগতির মহিমা সুস্পষ্ট করার জন্যই আমাদের এই চক্রযানের পরিকল্পনা।

যাঁরা মহা নেতা-নেত্রীদের সঙ্গী হয়ে হোটেলের থালাবাটি চুরি করার সুযোগ পান তাঁরা লন্ডন হুইল অবশ্য দেখে আসতে পারেন, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তো সেই শিকে ছেঁড়ে না। এমনকী মানস সরোবর যাত্রী বা হজযাত্রী হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেই জন্যেই গণমুখী চেতনায় কলকাতায় গঙ্গার পাড়ে একটি চক্রতীর্থ তৈরি করে জনগণের সেই দোলায় চড়ার শখ মেটাতে আমরা বদ্ধপরিকর। তবে সেটার নাম ইংরেজিতে ক্যালকাটা হুইল হবে অথবা বিশ্ববঙ্গ কবি সংসদের ভাবনা মতো কলকাতা চক্রযান বা সংক্ষেপে কলচক্রযান হবে কিনা কে জানে! কিন্তু বাংলা বানানের যেরকম রকমফেরি বাহার তাতে একটু ধন্দ আছে। ইংরেজি Academy থেকে যেমন দিল্লিতে অকাদেমি, কলকাতায় আকাদেমি এবং ঢাকায় আকাদেমী হয়, তেমনি শেষ পর্যন্ত কলকাতার এই নবনির্মিত চক্রটি যদি কালচক্রযান নাম ধারণ করে তাহলে একটু মুশকিল বৈকি! কেননা যেহেতু এটি চক্রাকার এবং ঘূর্ণায়মান, সুতরাং অবশ্যই চক্রযান এবং একালেই তার সৃষ্টি, অতএব কালবিচারে এটি কালচক্রযান হয়ে ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়। তবে সেটা 'কালান্তক' রূপ ধারণ করলে আশঙ্কার কারণ আছে।

আকাশের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করলেও এর উচ্চতার একটি পরিমাপ প্রকাশ করা হয়েছে, তবে অসীমের সীমাটি সাহেবি লন্ডন চক্রের সীমা লঙ্ঘন করবে না বলেই জানা গেছে। সাহেবরা অবশ্য অসীমের প্রতি স্পর্ধা জানিয়ে বেশ পার পেয়ে যায়, কিন্তু মেরা ভারত মহান দেশে এই অতিবাড়টা প্রায়শই সয় না। তাই এখানে রোপওয়ে প্রায়ই দড়ি ছিঁড়ে দোদুল্যমান হয়ে ঝোলে, রেলের সেতু না হয় গতির তোড়ে ভেঙে পড়ে, কিন্তু নদীর সেতুও গাড়ির ভারে ভেঙে পড়ে। এমনকী নির্মাণ কৌশলের দক্ষতায় রাস্তার ওপরে উড়াল সেতুও ভূমিকম্প ছাড়াই, থরো থরো করে ভেঙে পড়ে। যেমন এই সেদিন উত্তর কলকাতায় কোনও ভারের চাপ না থাকা সত্ত্বেও দিনদুপুরে বিবেকানন্দ ব্রিজ আপন মহিমার ভারে ভেঙে পড়ল যে, তা নিয়ে কী করা যেতে পারে ভেবে মন্ত্রী সান্ত্রীরা এখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

বিবেকানন্দ নামধারী এই উড়ালপুলটি উন্নয়নের পালকরূপে অত্যন্ত যত্নসহকারে নির্মিত হচ্ছিল অবশ্য যানজটের সমস্যা সমাধানে। কিন্তু গঙ্গাতীরে এই কালচক্রযান নির্মাণের নাকি তেমন কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য নেই। গঙ্গার সুড়ঙ্গপথে লন্ডনের

মতো রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতেই নাকি এই কালচক্রযানের পরিকল্পনা। বিশেষ করে যেখানে শহরের বাতাস বেশি পরিমাণ দূষিত হয়ে উঠছে সেখানে খানিকটা ওপরে উঠে নির্মল বায়ুভক্ষণ একটি উদ্দেশ্য হতে পারে। এবং তার জন্যে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো চালু হওয়ার পর সারা শহরের লোক অনায়াসেই এখানে জমায়েত হয়ে তাদের বুকের পাথরটা সহজেই একটু শুদ্ধিকরণের সুযোগ পেতে পারে।

নির্মল বায়ুসেবন যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো অত হাঙ্গামা না করে হাওড়া ব্রিজ ও হুগলি ব্রিজের যে দুটি করে চারটি স্তম্ভ আছে সেখানে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের মতো এসক্যালেটর বসিয়ে দিয়ে দুদিকের মাঝে স্কাইওয়ে করে দিলে জনগণের তথা নেতানেত্রীদের বায়ুরোগ শোধনের অনেক ভালো ব্যবস্থা করা যায়। একদিকে যাওয়া ও অন্যদিক দিয়ে ফেরার একটা চক্রাকার ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু সেটা বোধহয় একটাই অসুবিধে, কেননা কালচক্রযানের মধ্যে দিয়ে যে দোদুল দোলে দোলনার ব্যবস্থা সেটা কিন্তু ওই চক্রাকার স্কাইওয়ের মধ্যে ধরা যাবে না। তাছাড়া ওসব লড়ঝড়ে পুরনো ব্যবস্থায় কখনই নতুন করে কোনও প্রেরণালাভ করা যায় না। আর প্রেরণা না থাকলে বিশ্ববঙ্গে তার কোনও স্থান হতে পারে না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'নিয়মের রাজত্ব' নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, উঠিতেও নিয়ম, বসিতেও নিয়ম, এমনকী স্থির থাকিতেও নিয়ম। আমাদের বিশ্ববঙ্গে এখন 'প্রেরণা' সেই নিয়মের স্থান অধিকার করেছে। এখানে উঠিতেও প্রেরণা, বসিতেও প্রেরণা, গড়িতেও প্রেরণা এবং ভাঙিতেও বোধহয় প্রেরণার ভূমিকা। বিবেকানন্দ ব্রিজটি ভেঙে পড়ায় প্রেরণার আধিক্য অথবা প্রেরণার অভাব কোনটি বেশি কার্যকর হয়েছে, সেটি এখন গভীর অনুসন্ধানের বিষয় এবং যতক্ষণ না তা স্থিরীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ সেখানে ভাঙাগড়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বোধহয় সম্ভব নয়। কেননা কোনও মানুষ হয়তো নিজের উন্নয়নে প্রেরণার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে দেখা গেছে, কিন্তু একটা সমগ্র রাজ্য যে উন্নয়নের নেশায় প্রেরণাপাগল হয়ে উঠতে পারে তা এখন বিশ্ববঙ্গে প্রত্যক্ষ না করলে বোধগম্য হওয়া শক্ত। গঙ্গাবিধৌত দুই শহর কলকাতা ও হাওড়ার তটভূমিকে টেমসের মতো সুশোভিত ও সৌন্দর্যায়িত করার জন্য যে একটা কালচক্রযান নির্মাণের অনর্থক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই, প্রেরণার অভাবে সেকথাটা বোঝানো দুঃসাধ্য। আসলে তটভূমিকে কীভাবে সুন্দর করে তোলা যায় তার প্রমাণ দিয়েছে ফরাসিরা চন্দননগরে ও পণ্ডিচেরীতে। সুন্দর স্ট্র্যান্ড বানিয়ে। আর ব্রিটিশরা গঙ্গার তটভূমিকে করে তুলেছে তাদের পণ্য উৎপাদনের একের পর এক কারখানা। কলকাতার স্ট্র্যান্ডরোড ধরে রয়েছে পোর্টট্রাস্টের জঞ্জালের পাহাড় ও কতগুলো মালভাণ্ডারের ভূতের বাড়ি।

টেমস নদী একদিন আমাদের এই গঙ্গার মতোই ছিল পঙ্কিল ও আবিল এবং তটভূমি অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু আজ সেখানে তারা নদীর সংস্কার করে চার্চগেট স্টেশনের কাছে ন্যাশনাল থিয়েটার তথা উন্মুক্ত বিনোদনক্ষেত্র করেছে। প্যারিস এবং ফ্রাঙ্কফুর্টেও সিন ও মাইন নদীর ধারে দু'পাশ দিয়ে রাস্তা ও তার পাশে হর্ম্যরাজি এবং কর্ম ও বিনোদনক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। একইভাবে আমাদের গঙ্গাতীরকেও কর্মোদ্যোগে সুশোভিত করে তোলা যায়। প্রাথমিকভাবে হাওড়া সেতু ও হুগলি সেতুর মাঝখানে কলকাতা-হাওড়ার তীরবর্তী অংশকে গ্রহণ করা যায়। হাওড়া স্টেশনচত্বর থেকে হুগলি সেতুর দিকে অনেকখানি রাস্তা অকারণ কুশ্রী জঞ্জাল ও হানাবাড়িতে ভর্তি, সেগুলি স্থানান্তর করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। আর কলকাতার দিকে পোর্টট্রাস্টের পতিতভূমি পোড়োবাড়িগুলোকে পরিষ্কার করে সুশোভিত করাও দুঃসাধ্য নয়।

লন্ডনের মতোই সেখানে একটি ন্যাশনাল থিয়েটার, ব্যালে হাউস, ও অর্কেস্ট্রা হাউসের নির্মাণ করে একটি বিনোদনক্ষেত্র গড়ে তুলে কলকাতার একটি দীর্ঘস্থায়ী অভাব পূরণ করা যায়। আর অনর্থক ক্যালকাটা হুইল নির্মাণের টাকা জলে না ফেলে সেই টাকায় নদী ড্রেজিং করে দু'পাশের তটভূমি নবনির্মাণ করে সেখানে পিপিআর মডেল জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অবশ্যই যেতে পারে। বিশেষ করে হাওড়া ব্রিজের নীচে অবহেলিত ফুলের বাজারটিকে তো হুইল নির্মাণের স্থানে নন্দনকানন করে তোলা অবশ্যই যায়।

কিন্তু সেটা করা যে সম্ভব নয়, তার কারণ প্রেরণার অভাব। 'Gone with the wind' উপন্যাসের নায়ক একটি মূল্যবান উক্তি করেছিলেন— অর্থ ছপ্পড় ফুঁড়ে অর্জন করা যায়। দুভাবে— এক নির্মাণের সময় ও অপর ধ্বংসের কালে। আমাদের কালচক্রযান নির্মাণে এই দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে— এক নির্মাণের সময় এবং অপরটি এটি ভেঙে পড়ার সময়। সেইজন্যেই এই কালচক্রযানের পশ্চাতে এত প্রেরণার প্রবাহ। ■

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ

বার্ষিক সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ১৮ মার্চ ২০১৮, রবিবার (সকাল ৮-৩০-বিকাল ৪-৩০) কল্যাণ ভবন, ২৯ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিট, মানিকতলা (পোস্ট অফিস সন্নিকট), কলকাতা-৬-এ বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রত্যেক হোমিও চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুরাগীদের যোগদানের আবেদন জানাই।

যোগাযোগ

ডাঃ ভাস্কর হাজরা—৯৪৩২৪৬০৪১০
ডাঃ অর্পণ চৌধুরী—৯৬৪৭৬৫৬২৪৫
ডাঃ রাজীব রায়—৯৪৭৪৩৬৫৮১৫

শুভেচ্ছাসহ—
ডাঃ সুকুমার মণ্ডল
সভাপতি

ব্রহ্মচর্যপরায়ণ যুবসমাজ দেশের মেরুদণ্ড

সৌমিত্র চক্রবর্তী

মানব শরীর সপ্ত ধাতুর দ্বারা গঠিত। এই সপ্ত ধাতু হলো— রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র। এই সপ্ত ধাতুর মধ্যে শুক্রই সকল ধাতুর সার; সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট। এই শুক্রকেই বীর্য বলা হয়। কায়মনোবাক্যে এই বীর্যকে বিচলিত হতে না দেওয়া এবং সংযম ও তপস্যার দ্বারা এই বীর্যকে শরীরের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করাকেই 'ব্রহ্মচর্য' বলা হয়।

উপনিষদের যুগে ব্রহ্মচর্য বিদ্যা ছিল একমাত্র বিদ্যা যা প্রায় সকলেই অভ্যাস করতে চেষ্টা করত। আধ্যাত্মিক তথা আত্মিক উন্নতি ছিল সে যুগে পরম লক্ষ্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য— এই ছ'টি দুর্দান্ত রিপুকে বিশেষ ভাবে সংযত এবং বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করে একাগ্র মনে ইষ্টের ধ্যান করার মাধ্যমে নশ্বর দেহাস্থিত অবিনশ্বর আত্মার স্বরূপ জানাই ছিল ব্রহ্মচর্য পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে সনাতন আদর্শে ব্রহ্মচারীকে দেবতার আসন দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে সর্বপ্রকারের সংযম আবশ্যক। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে প্রত্যেক পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানকে প্রথম বোধন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৃহে পাঠাতেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে গার্হস্থ্য জীবনের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা। যেন সংসারের ঘূর্ণাবর্তে তারা লক্ষ্য ও আচার ভ্রষ্ট না হয়। সে যুগে বালকগণ দ্বাদশবর্ষ কাল গুরুগৃহে থেকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে নিজ নিজ আত্মোন্নতি করতে প্রয়াস পেত। অশন, বসন, শয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সর্বদা এবং সর্বত্র সংযমের কঠোরতা পালন করতে হতো। সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার, কঠিন শয্যায় শয়ন, গাছের ছাল পরিধান, ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রত্যহ শয্যাত্যাগ, পুষ্পচয়ন, সন্ধ্যাবন্দনাদিকরণ, শাস্ত্রপাঠ, গুরুসেবা--- এই সকল ছিল বালকদিগের নিত্ত-নৈমিত্তিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। দ্বাদশবর্ষকাল পর্যন্ত এইরূপ

কঠোরতার সঙ্গে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে যখন তারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করত, তখন তাদের পিতামাতা আনন্দের সঙ্গে মেধাবী, উদারমনস্ক, বীর্যবান যুবক সন্তানদের বরণ করে নিতেন। এই সকল যুবকরাই ছিল সেই যুগের সমাজের মেরুদণ্ড বা ভিত্তিশিলা। তাই সে সময়কার সমাজ ছিল উন্নত ও নিষ্কলুষ।

নানাপ্রকার জ্ঞান এবং অজ্ঞাত কারণে শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনা উৎপন্ন হয়ে বীর্যক্ষয় হয়ে থাকে। ক্ষণিকের আনন্দ বা তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে দেহের ব্রহ্মস্বরূপ সারবস্তু অর্থাৎ বীর্যের নির্গমন করা হয়ে থাকে। বীর্যধারণে ইচ্ছুক ব্রহ্মচর্যকামী যুবকগণ যদি বীর্যক্ষয়ের কারণগুলি সম্পর্কে অবহিত হয় তাহলে তাদের পক্ষে বীর্যধারণ প্রক্রিয়া আরও সহজতর হয়ে উঠবে :

১। অপরিমিত আহার, অসময়ের আহার, গুরুপাক (অতিরিক্ত তেল, ঝাল, মশলা, পেঁয়াজ, রসুন সংবলিত) বাসী পচা দ্রব্য আহার। ২। অনিদ্রা, দিবানিদ্রা, অতিনিদ্রা, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি। ৩। অলসতা বা কোনওপ্রকার শারীরিক পরিশ্রম না করা। ৪। মাদক দ্রব্য বা নেশাকারক দ্রব্য ব্যবহার করা যথা— পান, সুপারি, গুটখা, রজনীগন্ধা, খৈনি, মদ, গাঁজা, চরস, অতিরিক্ত চা এবং কফি ইত্যাদি। ৫। বেশভূষা চালচলনে বিলাসিতা বা বাবুগিরি। ৬। বিনা প্রয়োজনে কাউকে স্পর্শ করা। ৭। উদ্দেশ্যহীন হয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো। ৮। অশ্লীল নাটক-নভেল-উপন্যাস পড়া। অশ্লীল সিনেমা বা পর্নোগ্রাফি দেখা, ইন্টারনেটে অশ্লীল সাইট দেখা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা- ম্যাগাজিন পড়া বা দেখা। ধর্মগ্রন্থ পড়ার অজুহাতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির অশ্লীল অংশ বা রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করা।

প্রতিকার :

১। লঘু, অনুত্তেজক দ্রব্য পরিমিত রূপে আহার করা। অতিরিক্ত মাছ, মাংস, ডিম, ফাস্ট ফুড, জাংক ফুড না খাওয়া। নিরামিষ আহার ব্রহ্মচর্য পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে পরিগণিত হয়। ২। প্রতেকদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা। ৩। নিয়মিত ব্যায়াম করা, খেলাধুলা করা। নিয়মিত যোগাভ্যাস করা। যোগাসনের মধ্যে 'গোমুখাসন' একটি অপরিহার্য আসন। এই আসনের অভ্যাসের ফলে কামোত্তেজনা হ্রাস পায় ও বীর্যধারণ ক্ষমতা তথা সংযম বৃদ্ধি পায়। ৪। নাটক, নভেল, উপন্যাস, কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, অশ্লীল সিনেমা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় উত্তেজক বিষয় অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। ইন্টারনেট থেকে কেবল সেই সকল তথ্যই সংগ্রহ করতে হবে যা কিনা আমাদের জীবন গঠন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। ৫। মনকে সর্বদা সৎচিন্তা, সৎকার্য, ধ্যান, জপ, প্রার্থনা, উপাসনা প্রভৃতি আত্মগঠন মূলক কাজে নিযুক্ত রাখতে হবে। নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ বা গীতা পাঠ করলে মনের পরিবর্তন সাধিত হয়। ৬। পরস্ত্রীকে সর্বদা নিজের গর্ভধারিণী মায়ের মতো সম্মান করতে হবে। 'পরদারেষু মাতৃবৎ' এই বাক্যের কখনও অবমাননা করলে চলবে না। ৭। সবচেয়ে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে যে আমি একজন বিশুদ্ধ আত্মা। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আমি কোনও প্রকার কামনা-বাসনার বশবর্তী নয়। ■

পাকিস্তানি সিনেমার প্রবাদপ্রতিম হিন্দু নায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ঢাকায় পাকিস্তানের সুখ্যাত গজলশিল্পী মেহেদি হাসানের অনুষ্ঠান। কিছুক্ষণ আগেই তিনি গান শুরু করেছেন। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনছেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি গান বন্ধ করে দিলেন। এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'উনকী ইজাজৎ কী ব্যাগায়র হাম তো গা নহি সকতা। আপ লোগ নেহি জানতে ইয়েহ্ কওন হ্যায় আউর ইনকো হম কিস নজর সে দেখতে হ্যায়।' অর্থাৎ, ওঁর অনুমতি না পেলে আমি গাইতে পারব না। আপনারা জানেন না উনি কে আর আমি ওঁকে কী চোখে দেখি।

যাঁর সম্বন্ধে কথাগুলো বলা, তিনি ভারতে ততটা পরিচিত না হলেও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সিনেমার প্রবাদপ্রতিম নায়িকা। ১৮০টা উর্দু এবং বাংলা সিনেমায় অভিনয় করার অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। ঝরনা বসাকের নাম শুনলে আজও শ্রদ্ধায় ভালো লাগায় আপ্লুত হয়ে ওঠেন দুই দেশের মানুষ। ঝরনার জন্ম বাংলাদেশে। হিন্দু পরিবারে। পাকিস্তানে চলে যান ১৯৬৮ সালে। নাম পালটে হন শবনম। তারপর টানা ৩১ বছর ধরে চলে পাকিস্তানের রুপোলি পর্দায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য। বর্ণময় কেরিয়ারে অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন। নিগার পুরস্কারই পেয়েছেন ১৩ বার। তাছাড়া ২০১২ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে জীবনকৃতী পুরস্কার দিয়েছে। কিন্তু ঝরনার কাছে মানুষের ভালোবাসাই সর্বোত্তম পুরস্কার। পাকিস্তানের মানুষ তাঁকে বঞ্চিত করেননি। এখনও সেখানে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন পাকিস্তানি সিনেমার অধঃপতনের অন্যতম কারণ ঝরনার বাংলাদেশে চলে যাওয়া।

ঢাকার অভিজাত পাড়া গুলশনে ঝরনার কেতাদুরস্ত ফ্ল্যাটে গেলে মুখর হয়ে ওঠে অতীত। দেওয়ালে-দেওয়ালে অজস্র ছবি। বিশেষ করে চোখে পড়ে উর্দু ছবি আয়নার স্টিল। ছবিটি এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের বৃহত্তম হিট। ছবিতে ঝরনার নায়ক ছিলেন নাদিম। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন ঝরনার স্বামী রবীন ঘোষ। যাঁর সুরে মেহেদি হাসান গেয়েছিলেন সেই বিখ্যাত গান, 'মুঝে দিল সে না ভুলানা।' ৭৬ বছর বয়েসি ঝরনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হবে তিনি কি সানসেট বুলেভার্ড ছবির মোহময়ী নায়িকা নরমা ডেসমন্ডের বাঙালি সংস্করণ? কারণ নরমার মতো ঝরনাও তারকা। বার্ধক্যে পৌঁছলেও সময় তাদের তারকাসুলভ জৌলুসে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারেনি।

অবশ্য মানুষের হৃদয়ে ঝরনা যাই হোন, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি অন্যমানুষ। যত না সেলেব তার থেকে অনেক বেশি বাঙালি গৃহকর্ত্রী। দিব্যি আড্ডা দেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'কলকাতার সঙ্গে আমার অন্তরের যোগাযোগ। কেউ এলে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতেই হবে। ভাত-টক-ডাল-মাছ নিয়ে গল্প করতে হবে।'

ঝরনার বাবা নানু বসাক ফুটবলের রেফারি ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই ঝরনার অভিনয়ের শখ। নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন তিনি মেয়েকে। প্রথম সুযোগ এল ১৯৫৮ সালে। বাংলা ছবি 'এদেশ তোমার আমার'-এ একটি নাচের দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। দু'বছর পর তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ডাক পেলেন একটি উর্দু ছবিতে অভিনয় করার জন্য। প্রস্তাব শুনে মাথায় হাত! একবর্ণ উর্দু জানেন না, সংলাপ বলবেন কী করে? 'আমায় একটা বাংলা হরফে লেখা উর্দু স্ক্রিপ্ট দেওয়া হলো। ছ'মাস ধরে রিহার্সাল দিলাম। পরিচালক ঝরনা নাম পালটে শবনম রাখার কথা বললেন! আপত্তি করিনি। তবে নাম পালাটালেও আমি ইসলাম কবুল করিনি।' যে ছবির জন্য উর্দু শেখা সেই 'চন্দা' সুপারহিট করল। তারপর থেকে শুধুই শৃঙ্গজয়। একটার পর একটা। ১৯৭১ সাল। শবনমের ঢাকা যাবার ইচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান ছাড়ার অনুমতি পেলেন না। অনুমতি না পেলে বাংলাদেশের ভিসা পাওয়া সম্ভব নয়।— 'পরে আমি শুনেছিলাম, অনুমতি না দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের এক প্রভাবশালী প্রযোজক বিদেশ মন্ত্রককে অনুরোধ করেছিলেন। ওরা ভেবেছিলেন একবার বাংলাদেশে গেলে আমি আর ফিরব না। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আমার নামে লগ্নি করা হয়েছে পুরোটাই জলে যাবে। বাধ্য হয়ে প্রতিশ্রুতি দিলাম বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখেই আমি ফিরে আসব। ১৯৯৯ সালে আমি পাকাপাকি ভাবে পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসি। কিন্তু নতুন ছবিতে আর সাইন না করলেও বকেয়া কাজ মেটাতে আমার আরও দশ বছর সময় লেগেছিল।'

সুচিত্র সেনের ভক্ত ঝরনা এখনও পর্যন্ত ১৫টি বাংলাদেশে নির্মিত বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন। না, টলিউড তাঁকে ডাকেনি। কেউ চেনেও না। তাই নিয়ে ঝরনার কোনও আক্ষেপ নেই। তাঁর পা সবসময়েই মাটিতে থাকে। টলিউড বা বলিউড যদি ভালো অফার দেয় তাহলে তিনি কাজ করতে প্রস্তুত। আপাতত বাংলাদেশেই বয়ে চলেছেন ঝরনা। বাংলাদেশ তাঁর মাতৃভূমি। কিন্তু পিতৃভূমি? ঝরনা তাকিয়ে থাকেন খোলা জানলার বাইরে। ওই পথেই ভারতবর্ষে যাওয়া যায় কিনা কে জানে! ■

ফেডেরারই সর্বকালের সর্বোত্তম : বিজয় অমৃতরাজ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ভারতীয়দের মধ্যে এক সময়ে তাঁর নাম উচ্চারিত হতো সত্যজিৎ রায় ও পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে। বিশ্ব টেনিসের সেই বিখ্যাত ও বহুচর্চিত 'এ বি সি' অর্থাৎ অমৃতরাজ, বর্গ, কোনর্সের অন্যতম বিজয় অমৃতরাজ সম্প্রতি এসেছিলেন কলকাতায়। জয়দীপ মুখার্জির অ্যাকাদেমিতে সাংবাদিক সম্মেলনে অকপটে মেলে ধরলেন তাঁর ভাবনা চিন্তা।

প্রশ্ন : এত বছর পরে কলকাতায় এসে কীরকম লাগছে?

বিজয় : কলকাতা অনেক বদলে গেছে। মমতা ব্যানার্জির সাধের লন্ডন হতে না পারুক, এখন কলকাতা যে কোনও সুন্দর শহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আর এখানকার মানুষের আন্তরিকতা ও টেনিস প্রেম একইরকম আছে। সেই ১৯৮৭-তে সাউথ ক্লাবে ডেভিস কাপ টাই খেলার পর আবার কলকাতার সল্টলেকে টেনিস র‍্যাকেট হাতে কোর্টে নেমে অপার্থিব আনন্দ ও ভালোলাগায় মনপ্রাণ জারিত হয়েছে।

প্রশ্ন : কলকাতার টেনিসে নবজাগরণ কীভাবে সম্ভব?

বিজয় : কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বই, বেঙ্গালুরু এই চারটি মেট্রো শহর থেকেই মূলত ভারতের সেরা টেনিস খেলোয়াড়রা উঠে আসে। এখন হয়তো কলকাতার ছেলে ভারতীয় ডেভিস কাপ টিমে নেই কিন্তু তা বলে হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। জয়দীপ মুখার্জির অ্যাকাডেমির যা মান দেখলাম, তাতে অচিরেই এই অ্যাকাডেমির ছেলে-মেয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে দাপিয়ে বেড়াবে। এছাড়া সল্টলেকের বিটিএ অ্যাকাডেমি, জিমখানা ক্লাবের পরিকাঠামো ও পরিবেশও উদীয়মান টেনিস প্রতিভা তুলে আনার অনুকূল। আমার ধারণা এই সব অ্যাকাডেমি থেকে যথার্থ দক্ষতাসম্পন্ন খেলোয়াড়রা উঠে আসবে ও বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করবে।

প্রশ্ন : ভারত আবার কবে ওয়ার্ল্ডগ্রুপে স্থান পাবে?

বিজয় : এ বছরেই আবার ঢুকে পড়তে পারে এলিট গ্রুপে। লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি সরে যাবার পর একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ব টেনিসের মান

অস্বাভাবিক উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। অন্য সব খেলায় উৎকর্ষ বা মানের ক্ষেত্রে সেকাল ও একালের মধ্যে কোনও তুলনাই হয় না, কিন্তু টেনিসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। আগের দিনের তারকাদের তুলনায় শক্তি, গতি, দক্ষতা, টেকনিক স্কিল, টেম্পারামেন্ট অনেক উন্নত বর্তমান প্রজন্মের তারকাদের। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সেই ক্রমোন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না ভারতীয়রা। আগে এই ফাঁকটা খুব একটা বড় ছিল না। তাই ভারত তিনবার ডেভিস কাপ ফাইনাল খেলেছে। আর প্রতি বছরই এলিট গ্রুপে থেকে ডেভিস কাপ খেলেছে। অল ইন্ডিয়া টেনিস ফেডারেশন যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা যদি ঠিকমত ক্লিক করে তবে ভারত আবার ওয়ার্ল্ড গ্রুপে থেকে ডেভিস কাপ খেলবে।

প্রশ্ন : ভ্রামব্রি, রামকুমারদের সম্পর্কে কী মূল্যায়ন?

বিজয় : দুজনেই যথেষ্ট প্রতিভাবান। গত বছর বেশ কয়েকটি এটিপি চ্যালেঞ্জার টুর্নামেন্টে সাফল্য পেয়েছে। তবে চ্যালেঞ্জারে আটকে থাকলে হবে না। মূল এটিপি সার্কিটে ভাল পারফরমেন্স করতে পারলে যথার্থ স্বীকৃতি ও গুরুত্ব পাবে। সার্ভিস থেকে রিটার্ন, গ্রাউন্ড স্ট্রোক, ভলি, ক্রসকোর্ট ফোরহ্যান্ড, ব্যাকহ্যান্ড, ডাউন দ্য লাইন উইনার সব অস্ত্রে আরও শান দিতে হবে ট্যুরসার্কিটে টিকে থাকতে হলে। নিয়মিত বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলছে ওরা। এবারে কিছু প্রতিদান দিতে হবে দেশকে। ওদের বুঝতে হবে যে রমানাথন, রমেশ কৃষ্ণণ, বিজয় এবং আনন্দ অমৃতরাজ, লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি, সানিয়া মির্জার দেশ থেকে গিয়ে বিশ্ব টেনিসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাঁরা যে গৌরব-গরিমায় দিকচিহ্ন রচনা করে গেছেন তা দায়বদ্ধতার সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে রক্ষা করতে হবে।

প্রশ্ন : রজার ফেডেরার না রড লেভার কে সর্বকালের সেরা?

বিজয় : নিঃসন্দেহে রজার ফেডেরার। রড লেভার ওপেন যুগের আগে একাধিক গ্রান্ডস্লাম জিতেছেন যখন এত দেশ টেনিস খেলত না। তবে বেশ কিছু জিনিয়াস তখন বিশ্ব টেনিস আলো করে ছিলেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না এখন সারা বছর ১৫০টি দেশে সমসংখ্যক এটিপি টুর্নামেন্ট চলে তার সঙ্গে বিগ ফোর গ্রান্ডস্লাম। কয়েক হাজার তারকার দাপাদাপি। এসব সামলে ২০টি গ্রান্ডস্লাম-সহ টুর্নামেন্ট জেতার সেঞ্চুরি করতে চলা রজার ফেডেরার ছাড়া আর কে হতে পারেন সর্বকালের সেরা। ফেডেরার সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিটও বটে।

অনুশীলন সমিতি

বাংলার যুবকদের মধ্যে দেশভক্তি জাগিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপযুক্ত শরীর ও মন তৈরির আখড়া ছিল অনুশীলন সমিতি। ভারতে তখন ইংরেজ শাসন। বাঙালি যুবকদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি করা হতো অনুশীলন সমিতিতে।

অনুশীলন সমিতিতে যেমন দেশভক্তির পাঠ দেওয়া হতো, তেমনি শরীর শক্ত করার জন্য করানো হতো ব্যায়াম। সমিতির সদস্যরা ডন, বৈঠক, মুগুর, কুস্তি, লাঠিখেলা এসব করতো। তবে অনুশীলন সমিতি একবারে তৈরি হয়নি, প্রথমে সতীশচন্দ্র বসু নামে একজন উদ্যমী যুবক জেনারেল আসেম্বলি ইন্সটিটিউশনে একটি ব্যায়ামাগার খোলেন। সেটাই অনুশীলন সমিতির রূপ নেয় ১৯০২ সালের ২৪ মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন। প্রথমে এর নাম ছিল ভারত অনুশীলন সমিতি, পরে তা সংক্ষেপে হয় অনুশীলন সমিতি। শুধু পূর্ববঙ্গেই পাঁচশোর বেশি সমিতির শাখা ছিল। সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করা। সেইজন্য বাঙালিকে শরীর গঠন করতে হবে। মানসিকভাবে দৃঢ় হতে হবে। প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই অনুশীলন সমিতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুবকরা দলে দলে সমিতির সদস্য হতে থাকে। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন সমিতির বিস্তারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং দেশাত্মবোধক গেয়ে সদস্যদের উৎসাহিত করেন। ভগিনি নিবেদিতা সবসময় অনুশীলন সমিতির পাশে থেকেছেন। ধীরে ধীরে এই সমিতি বড় আকার ধারণ করতে থাকে এবং সরাসরি ইংরেজদের রাজত্বকে উৎখাত করতে নেমে পড়ে। সদস্যদের মানসিক উন্নতির জন্য বীরপুরুষদের জীবনকথা, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের কাহিনি শোনানো হতো। নিয়মিতভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি ও দেশের কথা নিয়ে আলোচনা

অনুশীলন সমিতির লোগো

সভা হতো। প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই গীতা পড়তে হতো। সপ্তাহে একদিন হতো রামায়ণ, মহাভারত পাঠ ও ব্যাখ্যা। এসবের পাশাপাশি সদস্যরা প্রতিদিন খেলার মাঠ ঝাড়ু দেওয়া, বইপত্র রোদ্রে দেওয়া, জঞ্জাল সাফ, নৌকায় দাঁড় টানা, সাইকেল চালানোর মতো কাজও করতো। অনুশীলন সমিতি ছিল একটি পরিবারের মতো। সমিতির নেতারা সবার দিকে সমান নজর রাখতেন। কে কতটা ব্যায়াম করছে, কে কতটা লাঠিখেলা শিখল, স্কুল-কলেজে ঠিকমত পড়াশুনা করছে কিনা। কারও অসুখ হলে সবাই তার খোঁজ নিতে যেতেন, কেউ সেখানে থেকে যেত তার সেবা করার জন্য।

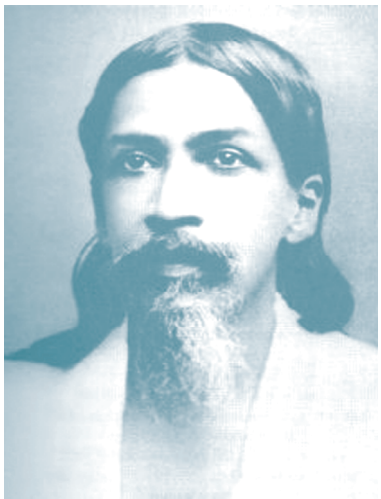

সমিতির সাধারণ কাজে যারা উত্তীর্ণ হতো তাদেরকে গুপ্ত কাজে নিয়োগ করা হতো। তবে সবাই সেই কাজ করার সুযোগ পেত না। অনেক পরীক্ষা দিতে হতো তাদের। যে পরীক্ষায় সফল হতো সেই সুযোগ পেত গুপ্ত কাজে অংশ নেওয়ার। দেওয়া হতো দীক্ষা। কালীমন্দিরে মায়ের সামনে নিজের হাতের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হতো। কোনও তথ্য বাইরে প্রকাশ করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ইত্যাদি। অনুশীলন সমিতিতে একসময় যোগ দেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই বারীন ঘোষ। মানিকতলার মুরারীপুকুরে কেন্দ্র তৈরি হয়। এখান থেকে তৈরি হওয়া বহু বিপ্লবী ইংরেজদের বোমা ছুঁড়ে মারে। অনুশীলন সমিতিকে ভয় পেতে থাকে ইংরেজ সরকার। তাদের পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুশীলন সমিতি সাহসিকতার সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা উল্লেখ না থাকলে ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে।

ভারতের পথে পথে

দার্জিলিং রায় ভিলা

ভগিনী নিবেদিতার শেষ দিনের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডের রায় ভিলা। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যা নিবেদিতা বহুবার, বহুদিন এই বাড়িতে থেকেছেন এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইউরোপীয়ান ধাঁচে তৈরি শতবর্ষ প্রাচীন এই বাড়িটির মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ রায়। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল পি কে রায়ের ভাই। তাঁর কাছ থেকে বাড়িটি নেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। নিবেদিতা অসুস্থ হয়ে পড়ায় জগদীশচন্দ্র ও অবলা বোস নিবেদিতাকে দার্জিলিংয়ের এই বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে আসেন। নিবেদিতার খুব পছন্দের জায়গা ছিল দার্জিলিংয়ের এই বাড়ি। নিবেদিতার মৃত্যুর সময় এই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার। বর্তমানে এই রায় ভিলাকে নিবেদিতার স্মৃতি বিষয়ক একটি সংগ্রহশালার রূপ দেওয়া হয়েছে।

জানো কি?

- পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর বারাণসী।
- সাদা হাতির দেশ থাইল্যান্ড।
- বজ্রপাতের দেশ ভুটান।
- মুক্তার দেশ কিউবা।
- নীরব শহর রোম।
- মরুভূমির দেশ আফ্রিকা।
- হাজার দ্বীপের দেশ ফিনল্যান্ড।
- বাতাসের শহর শিকাগো।
- বাজারের শহর কায়রো।

ভালো কথা

হরিণ ও বাঁদরের বন্ধুত্ব

সেদিন মা, বাবা, কাকু আর আমি জলদাপাড়া অভয়ারণ্য দেখতে গিয়েছিলাম। কাকু আগে থেকেই ওখানকার বিট অফিসের গেস্টরুম বুক করে রেখেছিল। সকাল ৯টায় আমরা হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছিলাম। গাছে গাছে কত ফুল, তাতে কত রকমের পাখি। মাহুত হঠাৎ হাতি দাঁড় করিয়ে বলল দেখ। আমরা দেখলাম— খালের ওপারে গাছের ওপর থেকে কচিপাতা ফেলে দিচ্ছে কিছু বাঁদর। নীচে মনের আনন্দে একদল হরিণ সেই পাতা খাচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, সব হরিণের পিঠে একটি করে বাঁদর বসে আছে। মাহুতকাকু বলল—কচিপাতার বদলে বাঁদররা হরিণের পিঠে বসে খেলা করে। হরিণ আর বাঁদরের বন্ধুত্ব দেখে আমার খুব ভালো লাগল।

প্রীতম সিংহ, নবম শ্রেণী, বোলপুর, বীরভূম।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

শীতের সকাল শীতের বিকেল

অরুণাভ দাস, নবম শ্রেণী, বৈদ্যবাটি, হুগলী

শিশিরে শিশিরে ভেজা
ঘাসে ঘাসে জল
সকালবেলায় সোনা রোদে
করে ঝলমল।
নানা রঙের গাঁদা ফুল
শীতের রাজা সে
নানা রঙের ভ্রমর আসে
মধুর সন্ধানে।

সাদা কুয়াশার চাদর ঢাকা
শীতের ভোরের বেলা
হাঁড় কাঁপুনি কনকনে শীত
তবু খাবার মেলা।
সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে
সময় বড় কম
দুপুর হতেই শেষ হয়ে যায়
সূর্যিমামার দম।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

অমৃতলোকে সাধনানন্দ মিশ্র

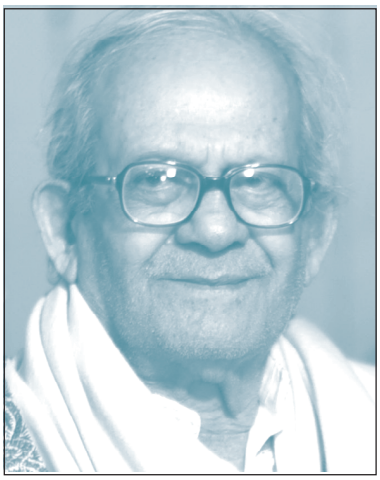

তুষারকান্তি ভট্টাচার্য॥ পিতা ডাঃ শরৎ চন্দ্র মিশ্র (এম-বি) এবং মাতা শান্তিময়ী দেবীর আট সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সাধনানন্দের বাল্য এবং কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে মুগবেড়িয়ায়। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই ঘটে গেল পিতৃবিয়োগ। পরিবারের দুরূহ দায়িত্বে তখন তাঁর দিগভ্রান্ত দশা। সেই সঙ্গে পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষার অসম যুদ্ধ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগদান করলেন ১৯৪৪ সালে যখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। গান্ধী হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো ১৯৪৮ সালের মার্চে। সেই সময় তিনি একটি জমি রেজিস্ট্রি উপলক্ষে মহিষাদলের রেজিস্ট্রি অফিসে ব্যস্ত। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো উদয় হলেন আই-বি ইন্সপেক্টর ইন্টেলিজ্যান্স ব্রাঞ্চ মিঃ গোবর্ধন হাজরা। তমলুক থানায় সারা রাত্রি ধরে চলল জেরা। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো কেন? আসলে চার বছর আগে ১৯৪৪ সালে শ্যামাপ্রসাদের নির্দেশে যে পাঁচজন যুবক মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন সাধনানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই কারণে গান্ধী হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো সন্দেহের বশে। চালান করা হলো মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। মুক্তি পেলেন পাঁচ মাস পর ১৯৪৮-এর জুলাইতে। পরবর্তীকালে তিনি সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষা গ্রহণ করেন। কলকাতার উত্তরপূর্ব ভাগের ছিলেন সঙ্ঘচালক।

১৯৫১-র ২৮ ফেব্রুয়ারি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন মুক্তি ভট্টাচার্যের সঙ্গে। মাত্র এক বছর আগে ২০১৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেই বন্ধন চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায় মুক্তি দেবীর সময়োচিত তিরোধানে।

নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টা বিদ্রূপের পরোয়া না করে সঙ্ঘের সপক্ষেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে সোচ্চার ছিলেন আজীবন। জীবনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থের পেছনে ছোটেননি কখনো। তবুও জীবিকা নির্বাহের জন্য তমলুক আদালতে যোগ দিলেন সদ্য ওকালতি পাশ করা যুবক সাধনানন্দ। পরবর্তীকালে কলকাতা নগর দেওয়ানি আদালতের বার-এর সদস্য হয়ে কলকাতায় আগমন। এখানে খুঁজে পেলেন বেঁচে থাকার মতো কিছু সংস্থান। প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া এবং স্টেটসম্যান পত্রিকা তাঁকে নিয়োগ করল আদালত সংবাদদাতা হিসেবে।

সাধনানন্দ ছিলেন 'হিউম্যান গুগুল'। ভারতের সব তীর্থস্থানের অবস্থান তাঁর চোখের সামনে ভাসত। কারণ ভ্রমণ ছিল তাঁর নেশা। এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের সার্থক প্রতিফলন ঘটল তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনি— 'কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরীর দিব্যদেশে।' লেখার হাত ছিল ঝরঝরে। যে কোনও বিষয়— তা ইতিহাস, পুরাণ, অধ্যাত্ম বিষয়, শ্রীমদ্‌ভাগবত বা রামায়ণ, মহাভারত বা ভারতবোধ— তাৎক্ষণিকভাবে অতি অল্প অবকাশে অনায়াসে অক্ষরবন্দি করে ফেলতে পারতেন। সব লেখাই হতো সুখপাঠ্য। মৃত্যুর ক'দিন আগেও তাঁর লেখনী অমৃত প্রসব করেছে। পঠন-পাঠন এই ছিল তাঁর মুখ্যকর্ম। অথচ জ্ঞান তাঁকে কখনোই পাণ্ডিত্যের মোহজালে আচ্ছন্ন করেনি। ইংরেজি থেকে অনুবাদ এতটাই প্রাণবন্ত এবং আটপৌরে হতো যে বোঝাই যেত না এটা সাধনানন্দের মৌলিক রচনা নয়। স্বস্তিকা, বিশ্ব হিন্দু বার্তা-তে প্রায়শই তাঁর লেখা স্থান পেয়েছে রচনার প্রসাদগুণে। সঙ্ঘের প্রবাদ পুরুষরা তাঁর কাছে প্রাতঃস্মরণীয় তো ছিলেনই। আদি শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজী ছিলেন তাঁর নিত্য প্রেরণা। নিত্য আবৃত্তি করতেন শঙ্করাচার্যের 'মোহমুদগর'

—'মা কুরু ধনজনযৌবনগরং/হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।'

কখনোই প্রচারের আলোয় আসতে চাননি। বড় বিপন্ন বোধ করতেন প্রশংসা বর্ষণে। বলতেন— 'সংস্কৃত না জানলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। কিছু মূঢ়জন সচেতনভাবে দেবভাষাকে ধ্বংস করছে।' মৃত্যুর একমাস আগেও আংশিক সূর্যপ্রণাম করতেন। শরীরে রোগজ্বালা তেমন ছিল না।

হঠাৎ ৩১ জানুয়ারি ২০১৮-তে প্রবল শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন। নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে ডাক্তার বলেন--- চেস্ট ইনফেকশন। চব্বিশ ঘণ্টা অক্সিজেন এবং নেবুলাইজার সার্পোটেই ছিলেন। কিছুটা সুস্থবোধ করলে বাড়ি নিয়ে আসা হয় পূর্ণ মেডিক্যাল সাপোর্টে। চারদিন পর ১১ ফেব্রুয়ারি আবার তাঁকে নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় সার্বিক ইনভেস্টিগেশনের জন্য। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪-৫০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রেখে গেছেন দু' কন্যা, জামাতা এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের ভরা সংসার, আর অজস্র গুণমুগ্ধ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাধনানন্দের মজ্জায়। তাঁরই ছন্দে শেষ কথা--- 'জীবপালিনী, তুমি পুষেছ খণ্ডকালের ছোট ছোট পিঞ্জরে। তারই মধ্যে সব খেলার সীমা। সব কীর্তির অবসান।'■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
5 March - 2018 - Rs. 10.00

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা ।।